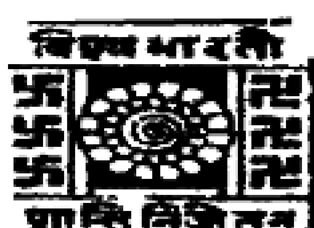
দুই বোন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ	ফাল্গুন, ১৩৩৯
দ্বিতীয় সংস্করণ	ফাল্গুন, ১৩৪২
পুনর্মুদ্রণ	চৈত্র, ১৩৪৭
পুনর্মুদ্রণ	ফাল্গুন, ১৩৫০

মূল্য পাঁচ সিকা ও দুই টাকা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

৩১০০—২৫. ৩. ৪৪

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু

করকমলে

দুই বোন

শর্মিলা

মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত ক'রে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্বদেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।

শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা মায়ের জাত।

বড়ো বড়ো শান্ত চোখ; ধীর গভীর তার চাহনি; জলভরা নবমেঘের মতো নধর দেহ, স্নিগ্ধ শ্যামল; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণরেখা; শাড়ির কালো পাড়টি প্রশস্ত; দুই হাতে মকরমুখো মোটা দুই বালা, সেই

ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয়, শুভসাধনের ভাষা।

স্বামীর জীবনলোকে এমন কোনো প্রত্যন্তদেশ নেই যেখানে তার সাম্রাজ্যের প্রভাব শিথিল। স্ত্রীর অতি-লালনের আওতায় স্বামীর মন হয়ে পড়েছে অসাবধান। ফাউন্টেন কলমটা সামান্য দুর্যোগে টেবিলের কোনো অনতিলক্ষ্য অংশে ক্ষণকালের জন্যে অগোচর হোলে সেটা পুনরাবিষ্কারের ভার স্ত্রীর 'পরে। স্নানে যাবার পূর্বে হাতঘড়িটা কোথায় ফেলেছে শশাঙ্কর হঠাৎ সেটা মনে পড়ে না, স্ত্রীর সেটা নিশ্চিত চোখে পড়ে। ভিন্ন রঙের দু-জোড়া মোজার এক-এক পাটি এক-এক পায়ে প'রে বাইরে যাবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত, স্ত্রী এসে তার প্রমাদ সংশোধন করে দেয়। বাংলা মাসের সঙ্গে ইংরেজি মাসের তারিখ জোড়া দিয়ে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে, তার পরে অকালে অপ্রত্যাশিত অতিথিসমাগমের আকস্মিক দায় পড়ে স্ত্রীর উপর। শশাঙ্ক নিশ্চয় জানে দিনযাত্রায় কোথাও ত্রুটি ঘটলেই স্ত্রীর হাতে তার সংস্কার হবেই, তাই ত্রুটি ঘটানোই তার স্বভাব হয়ে পড়েছে। স্ত্রী সস্নেহ তিরস্কারে বলে, "আর তো পারিনে। তোমার কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না!" যদি শিক্ষা হোত তবে

শর্মিলার দিনগুলো হোত অনাবাদি ফসলের জমির মতো।

শশাঙ্ক হয়তো বন্ধুমহলে নিমন্ত্রণে গেছে। রাত এগারোটা হোলো, দুপুর হোলো, ব্রিজ খেলা চলছে। হঠাৎ বন্ধুরা হেসে উঠল, "ওহে, তোমার সমনজারির পেয়াদা। সময় তোমার আসন্ন।"

সেই চিরপরিচিত মহেশ চাকর। পাকা গোঁফ, কাঁচা মাথার চুল, গায়ে মেরজাই পরা, কাঁধে রঙিন ঝাড়ন, বগলে বাঁশের লাঠি। মাঠাকরুন খবর নিতে পাঠিয়েছেন বাবু কি আছেন এখানে। মাঠাকরুনের ভয়, পাছে ফেরবার পথে অন্ধকার রাতে দুর্যোগ ঘটে। সঙ্গে একটা লণ্ঠনও পাঠিয়েছেন।

শশাঙ্ক বিরক্ত হয়ে তাস ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। বন্ধুরা বলে, "আহা একা অরক্ষিত পুরুষমানুষ।" বাড়ি ফিরে এসে শশাঙ্ক স্ত্রীর সঙ্গে যে আলাপ করে সেটা না স্নিগ্ধ ভাষায় না শান্ত ভঙ্গিতে। শর্মিলা চুপ ক'রে ভর্ৎসনা মেনে নেয়। কী করবে, পারে না থাকতে। যতপ্রকার অসম্ভব বিপত্তি ওর অনুপস্থিতির অপেক্ষায় স্বামীর পথে ষড়যন্ত্র করে এ আশঙ্কা ও কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না।

বাইরে লোক এসেছে, হয়তো কাজের কথায়। ক্ষণে ক্ষণে অন্তঃপুর থেকে ছোটো ছোটো চিরকুট আসছে, "মনে আছে কাল তোমার অসুখ করেছিল। আজ সকাল সকাল খেতে এসো।" রাগ করে শশাঙ্ক, আবার হারও মানে। বড়ো দুঃখে একবার স্ত্রীকে বলেছিল, "দোহাই তোমার, চক্রবর্তীবাড়ির গিন্নির মতো একটা ঠাকুরদেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বেশি। দেবতার সঙ্গে সেটা ভাগাভাগি ক'রে নিতে পারলে সহজ হয়। যতই বাড়াবাড়ি করো দেবতা আপত্তি করবেন না, কিন্তু মানুষ যে দুর্বল।"

শর্মিলা বললে, "হায় হায়, একবার কাকাবাবুর সঙ্গে যখন হরিদ্বার গিয়েছিলুম, মনে আছে তোমার অবস্থা।"

অবস্থাটা যে অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল এ-কথা শশাঙ্কই প্রচুর অলংকার দিয়ে একদা স্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা করেছে। জানত এই অত্যুক্তিতে শর্মিলা যেমন অনুতপ্ত তেমনই আনন্দিত হবে। আজ সেই অমিত-ভাষণের প্রতিবাদ করবে কোন্ মুখে। চুপ ক'রে মেনে যেতে হোলো, শুধু তাই নয়, সেদিনই ভোরবেলায়

অল্প একটু যেন সর্দির আভাস দেখা দিয়েছে শর্মিলার এই কল্পনা অনুসারে তাকে কুইনিন খেতে হোলো দশ গ্রেন, তা ছাড়া তুলসীপাতার রস দিয়ে চা। আপত্তি করবার মুখ ছিল না। কারণ ইতিপূর্বে অনুরূপ অবস্থায় আপত্তি করেছিল, কুইনিন খায়নি, জ্বরও হয়েছিল, এই বৃত্তান্তটি শশাঙ্কের ইতিহাসে অপরিমোচনীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

ঘরে আরোগ্য ও আরামের জন্যে শর্মিলার এই যেমন সস্নেহ ব্যগ্রতা বাইরে সম্মান রক্ষার জন্যে তার সতর্কতা তেমনি সতেজ। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে।

একবার বেড়াতে গিয়েছিল নৈনিতালে। আগে থাকতে সমস্ত পথ কামরা ছিল রিজার্ভ-করা। জংশনে এসে গাড়ি বদলিয়ে আহারের সন্ধানে গেছে। ফিরে এসে দেখে উর্দিপরা দুর্জনমূর্তি ওদের বেদখল করবার উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত। স্টেশনমাস্টার এসে এক বিশ্ববিশ্রুত জেনেরালের নাম ক'রে বললে, কামরাটা তাঁরই, ভুলে অন্য নাম খাটানো হয়েছে। শশাঙ্ক চক্ষু বিস্ফারিত করে সসম্ভ্রমে অন্যত্র যাবার উপক্রম করছে, হেনকালে শর্মিলা গাড়িতে উঠে দরজা আগলিয়ে বললে, "দেখতে

চাই কে আমাকে নামায়। ডেকে আনো তোমার জেনেরালকে।” শশাঙ্ক তখনো সরকারি কর্ম্মচারী, উপরওআলার জ্ঞাতিগোত্রকে যথোচিত পাশ কাটিয়ে নিরাপদ পথে চলতে সে অভ্যস্ত। সে ব্যস্ত হয়ে যত বলে, “আহা, কাজ কী, আরো তো গাড়ি আছে,”—শর্ম্মিলা কানই দেয় না। অবশেষে জেনেরাল সাহেব রিফ্রেশমেণ্ট রুমে আহার সমাধা ক'রে চুরুট মুখে দূর থেকে স্ত্রীমূর্ত্তির উগ্রতা দেখে গেল হ'টে। শশাঙ্ক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, “জানো কতবড়ো লোকটা।” স্ত্রী বললে, “জানার গরজ নেই। যে গাড়িটা আমাদের, সে গাড়িতে ও তোমার চেয়ে বড়ো নয়।”

শশাঙ্ক প্রশ্ন করলে, “যদি অপমান করত।”

শর্ম্মিলা জবাব দিলে, “তুমি আছ কী করতে।”

শশাঙ্ক শিবপুরে পাস-করা এঞ্জিনিয়ার। ঘরের জীবনযাত্রায় শশাঙ্কের যতই ঢিলেমি থাক্ চাকরির কাজে সে পাকা। প্রধান কারণ, কর্ম্মস্থানে যে তুঙ্গী গ্রহের নির্ম্মম দৃষ্টি সে হচ্ছে যাকে চলতি ভাষায় বলে বড়োসাহেব। স্ত্রীগ্রহ সে নয়। শশাঙ্ক ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারি পদে যখন অ্যাক্‌টিনি করছে এমন সময় আসন্ন উন্নতির মোড় ফিরে গেল উল্‌টো দিকে। যোগ্যতা ডিঙিয়ে কাঁচা অভিজ্ঞতা

সত্ত্বেও যে ইংরেজ যুবক বিরল গুম্ফরেখা নিয়ে তার আসন দখল করলে কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তার সম্পর্ক ও সুপারিশ বহন ক'রে তার এই অভাবনীয় আবির্ভাব।

শশাঙ্ক বুঝে নিয়েছে এই অর্বাচীনকে উপরের আসনে বসিয়ে নিচের স্তরে থেকে তাকেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। কর্তৃপক্ষ পিঠে চাপড় মেরে বললে, "ভেরি সরি মজুমদার, তোমাকে যত শীঘ্র পারি উপযুক্ত স্থান জুটিয়ে দেব।" এরা দুজনেই এক ফ্রীমেসন্ লজের অন্তর্ভুক্ত।

তবু আশ্বাস ও সান্ত্বনা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারটা মজুমদারের পক্ষে অত্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠল। ঘরে এসে ছোটোখাটো সব বিষয়ে খিটখিট শুরু করে দিলে। হঠাৎ চোখে পড়ল তার আপিসঘরের এককোণে ঝুল, হঠাৎ মনে হোলো চৌকির উপরে যে সবুজ রঙের ঢাকাটা আছে সে রঙটা ও দু-চক্ষে দেখতে পারে না। বেহারা বারান্দা ঝাড় দিচ্ছিল, ধুলো উড়ছে ব'লে তাকে দিল একটা প্রকাণ্ড ধমক। অনিবার্য ধুলো রোজই ওড়ে কিন্তু ধমকটা সদ্য নূতন।

অসম্মানের খবরটা স্ত্রীকে জানালে না। ভাবলে যদি কানে ওঠে তাহলে চাকরির জালটাতে আরো

একটা গ্রন্থি পাকিয়ে তুলবে,— হয়তো বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসবে অমধুর ভাষায়। বিশেষত ঐ ডোনাল্ডসনের উপর তার রাগ আছে। একবার সে সার্কিট-হৌসের বাগানে বাঁদরের উৎপাত দমন করতে গিয়ে ছররাগুলিতে শশাঙ্কর সোলার টুপি ফুটো করে দিয়েছে। বিপদ ঘটেনি কিন্তু ঘটতে তো পারত। লোকে বলে দোষ শশাঙ্কেরই, শুনে তার রাগ আরো বেড়ে ওঠে ডোনাল্ডসনের 'পরেই। সকলের চেয়ে রাগের কারণটা এই, বাঁদরকে লক্ষ্য-করা গুলি শশাঙ্কের উপর পড়াতে শত্রুপক্ষ এই দুটো ব্যাপারের সমীকরণ ক'রে উচ্চহাস্য করেছে।

শশাঙ্কের পদ-লাঘবের খবরটা শশাঙ্কের স্ত্রী স্বয়ং আবিষ্কার করলে। স্বামীর রকম দেখেই বুঝেছিল সংসারে কোনোদিক থেকে একটা কাঁটা উঁচিয়ে উঠেছে। তার পরে কারণ বের করতে সময় লাগেনি। কনস্টিট্যুশনাল অ্যাজিটেশনের পথে গেল না, গেল সেল্ফ ডিটামিনেশনের অভিমুখে। স্বামীকে বললে, "আর নয়, এখনি কাজ ছেড়ে দাও।"

দিতে পারলে অপমানের জোঁকটা বুকের কাছ থেকে খসে পড়ে। কিন্তু ধ্যানদৃষ্টির সামনে প্রসারিত রয়েছে

বাঁধা মাইনের অন্নক্ষেত্র, এবং তার পশ্চিমদিগন্তে পেনশনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা।

শশাঙ্কমৌলি যে-বছরে এম. এসসি. ডিগ্রীর সর্বোচ্চ শিখরে সদ্য অধিরূঢ়, সেই বছরেই তার শ্বশুর শুভ-কর্মে বিলম্ব করেননি— শশাঙ্কের বিবাহ হয়ে গেল শর্মিলার সঙ্গে। ধনী শ্বশুরের সাহায্যেই এঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে। তার পরে চাকরিতে দ্রুত উন্নতির লক্ষণ দেখে রাজারামবাবু জামাতার ভাবী সচ্ছলতার ক্রম-বিকাশ নির্ণয় করে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। মেয়েটিও আজ পর্যন্ত অনুভব করেনি তার অবস্থান্তর ঘটেছে। শুধু যে সংসারে অনটন নেই তা নয় বাপের বাড়ির চালচলন এখানেও বজায় আছে। তার কারণ, এই পারিবারিক দ্বৈরাজ্যে ব্যবস্থাবিধি শর্মিলার অধিকারে। ওর সন্তান হয়নি, হবার আশাও বোধ করি ছেড়েছে। স্বামীর সমস্ত উপার্জন অখণ্ডভাবে এসে পড়ে ওরই হাতে। বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে ঘরের অন্নপূর্ণার কাছে ফিরে ভিক্ষা না মেগে শশাঙ্কর উপায় নেই। দাবি অসংগত হোলে নামঞ্জুর হয়, মেনে নেয় মাথা চুলকিয়ে। অপর কোনোদিক থেকে নৈরাশ্যটা পূরণ হয় মধুর রসে।

শশাঙ্ক বললে, "চাকরি ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। তোমার জন্যে ভাবি, কষ্ট হবে তোমারি।"

শর্মিলা বললে, "তার চেয়ে কষ্ট হবে যখন অন্যায়-টাকে গিলতে গিয়ে গলায় বাধবে।"

শশাঙ্ক বললে, "কাজ তো করা চাই, ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবকে খুঁজে বেড়াব কোন্ পাড়ায়।"

"সে পাড়া তোমার চোখে পড়ে না। তুমি যাকে ঠাট্টা ক'রে বলো তোমার চাকরির লুচি-স্থান, বে-লুচি-স্থান মরুপ্রদেশের ওপারে, তার বাইরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি গণ্যই করো না।"

"সর্বনাশ। সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে মস্ত প্রকাণ্ড। রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরোবে কে। অতবড়ো দুরবীন পাই কোন্ বাজারে।"

"মস্ত দুরবীন তোমাকে কষতে হবে না। আমার জ্ঞাতিসম্পর্কের মথুরদাদা কলকাতায় বড়ো কন্ট্রাক্টর, তাঁর সঙ্গে ভাগে কাজ করলে দিন চলে যাবে।"

"ভাগটা ওজনে অসমান হবে। এপক্ষে বাটখারায় কমতি। খুঁড়িয়ে শরিকি করতে গেলে পদমর্যাদা থাকবে না।"

"এপক্ষে কোনো অংশেই কমতি নেই। তুমি জানো,

বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখে গেছেন, সুদে বাড়ছে। শরিকের কাছে তোমাকে খাটো হোতে হবে না।"

"সে কি হয়। ও টাকা যে তোমার।" বলে শশাঙ্ক উঠে পড়ল। বাইরে লোক বসে আছে।

শর্মিলা স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে বললে, "আমিও যে তোমারি।"

তার পর বললে, "বের করো তোমার জেব থেকে ফাউণ্টেনপেন, এই নাও চিঠির কাগজ, লেখো রেজিগ্‌নেশন পত্র। সেটা ডাকে রওনা না ক'রে আমার শান্তি নেই।"

"আমারো শান্তি নেই বোধ হচ্ছে।"

লিখলে রেজিগ্‌নেশন পত্র।

পরদিনেই শর্মিলা চলে গেল কলকাতায়, উঠল গিয়ে মথুরদাদার বাড়িতে। অভিমান করে বললে, "একদিনো তো বোনের খবর নাও না।" মেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হোলে বলত, "তুমিও তো নাও না।" পুরুষের মাথায় সে জবাব জোগাল না। অপরাধ মেনে নিলে।

বললে, "নিশ্বাস ফেলবার কি সময় আছে। নিজে আছি কি না তাই ভুল হয়ে যায়। আর তা ছাড়া তোমরাও তো দূরে দূরে বেড়াও।"

শর্মিলা বললে, "কাগজে দেখলুম ময়ূরভঞ্জ না মথুরগঞ্জ কোথায় একটা ব্রিজ তৈরির কাজ পেয়েছ। প'ড়ে এত খুশী হলুম। তখনি মনে হোলো মথুরদাদাকে নিজে গিয়ে কন্‌গ্র্যাচুলেট ক'রে আসি।"

"একটু সবুর কোরো খুকি। এখনো সময় হয়নি।"

ব্যাপারখানা এই : নগদ টাকা ফেলার দরকার। মাড়োয়ারি ধনীর সঙ্গে ভাগে কাজ করার কথা। শেষ-কালে প্রকাশ হোলো যে-রকম শর্ত তাতে শাঁসের ভাগটাই মাড়োয়ারির আর ছিবড়ের ভাগটাই পড়বে ওর কপালে। তাই পিছোবার চেষ্টা।

শর্মিলা ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, "এ কখনো হোতেই পারে না। ভাগে কাজ করতে যদি হয় আমাদের সঙ্গে করো। এমন কাজটা তোমার হাত থেকে ফস্‌কে গেলে ভারি অন্যায় হবে। আমি থাকতে এ হোতেই দেব না, যাই বলো তুমি।"

এর পরে লেখাপড়া হোতেও দেরি হোলো না; মথুরদাদার হৃদয়ও বিগলিত হোলো।

ব্যবসা চলল বেগে। এর আগে চাকরির দায়িত্বে শশাঙ্ক কাজ করেছে, সে-দায়িত্বের সীমা ছিল পরিমিত। মনিব ছিল নিজের বাইরে, দাবি এবং দেয় সমান সমান ওজন মিলিয়ে চলত। এখন নিজেরই প্রভুত্ব নিজেকে চালায়। দাবি এবং দেয় এক জায়গায় মিলে গেছে। দিনগুলো ছুটিতে কাজেতে জাল-বোনা নয়, সময়টা হয়েছে নিরেট। যে দায়িত্ব ওর মনের উপর চেপে সেটাকে ইচ্ছে করলেই ত্যাগ করা যায় ব'লেই তার জোর এত কড়া। আর কিছু নয়, স্ত্রীর ঋণ শুধতেই হবে, তার পরে ধীরে সুস্থে চলবার সময় পাওয়া যাবে। বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়ি, মাথায় সোলার টুপি, আস্তিন গোটানো, খাকির প্যাণ্ট পরা, চামড়ার কোমরবন্ধ আঁটা, মোটা সুকতলাওআলা জুতো, চোখে রোদ বাঁচাবার রঙিন চশমা,—শশাঙ্ক উঠে পড়ে লেগে গেল কাজে। স্ত্রীর ঋণ যখন শোধ হবার কিনারায় এল, তখনো ইস্টিমের দম কমায় না, মনটা তখন উঠেছে গরম হয়ে।

ইতিপূর্বে সংসারে আয়ব্যয়ের ধারাটা বইত একই খাদে, এখন হোলো দুই শাখা। একটা গেল ব্যাঙ্কের দিকে, আর একটা ঘরের দিকে। শর্মিলার বরাদ্দ পূর্বের মতোই আছে, সেখানকার দেনাপাওনার

রহস্য শশাঙ্কর অগোচরে। আবার ব্যবসায়ের ঐ চামড়া-বাঁধানো হিসেবের খাতাটা শর্মিলার পক্ষে দুর্গম দুর্গ বিশেষ। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু স্বামীর ব্যবসায়িক জীবনের কক্ষপথ ওর সংসারচক্রের বাইরে পড়ে যাওয়াতে সেই দিক থেকে ওর বিধিবিধান উপেক্ষিত হোতে থাকে। মিনতি ক'রে বলে, "বাড়াবাড়ি কোরো না, শরীর যাবে ভেঙে।" কোনো ফল হয় না। আশ্চর্য এই, শরীরও ভাঙছে না। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ, বিশ্রামের অভাব নিয়ে আক্ষেপ, আরামের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ততা ইত্যাদি শ্রেণীর দাম্পত্যিক উৎকণ্ঠা সবেগে উপেক্ষা ক'রে শশাঙ্ক সকালবেলায় সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফোর্ড গাড়ি নিজে হাঁকিয়ে শিঙে বাজিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেলা দুটো-আড়াইটার সময় ঘরে ফিরে এসে বকুনি খায়, এবং আর আর খাওয়াও দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ করে।

একদিন ওর মোটরগাড়ির সঙ্গে আর কার গাড়ির ধাক্কা লাগল। নিজে গেল বেঁচে, গাড়িটা হোলো জখম, পাঠিয়ে দিল তাকে মেরামত করতে। শর্মিলা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বাষ্পাকুলকণ্ঠে বললে, "গাড়ি তুমি নিজে হাঁকাতে পারবে না।"

শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে, "পরের হাতের আপদও একই জাতের দুষমন।"

একদিন কোন্ মেরামতের কাজ তদন্ত করতে গিয়ে জুতো ফুঁড়ে পায়ে ফুটল ভাঙা প্যাকবাক্সর পেরেক, হাসপাতালে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ধনুষ্টংকারের টিকে নিলে, সেদিন কান্নাকাটি করলে শর্মিলা, বললে, "কিছুদিন থাকো শুয়ে।"

শশাঙ্ক অত্যন্ত সংক্ষেপে বললে "কাজ।" এর চেয়ে বাক্য আর সংক্ষেপ করা যায় না।

শর্মিলা বললে, "কিন্তু"—এবার বিনা বাক্যেই ব্যাণ্ডেজ সুদ্ধ চলে গেল কাজে।

জোর খাটাতে আর সাহস হয় না। আপন ক্ষেত্রে পুরুষের জোর দেখা দিয়েছে। যুক্তিতর্ক কাকুতি-মিনতির বাইরে একটিমাত্র কথা, "কাজ আছে।" শর্মিলা অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকে। দেরি হোলেই ভাবে মোটরে বিপদ ঘটেছে। রোদ্দুর লাগিয়ে স্বামীর মুখ যখন দেখে রক্তবর্ণ, মনে করে নিশ্চয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভয়ে ভয়ে আভাস দেয় ডাক্তারের—স্বামীর ভাবখানা দেখে ঐখানেই থেমে যায়। মন খুলে উদ্বেগ প্রকাশ করতেও আজকাল ভরসা হয় না।

শশাঙ্ক দেখতে দেখতে রোদে-পোড়া, খটখটে হয়ে উঠেছে। খাটো আঁট কাপড়, খাটো আঁট অবকাশ, চালচলন দ্রুত, কথাবার্তা স্ফুলিঙ্গের মতো সংক্ষিপ্ত। শর্মিলার সেবা এই দ্রুত লয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চেষ্টা করে। স্টোভের কাছে কিছু খাবার সর্বদাই গরম রাখতে হয়, কখন্ স্বামী হঠাৎ অসময়ে ব'লে বসে "চললুম, ফিরতে দেরি হবে।" মোটরগাড়িতে গোছানো থাকে সোডাওআটার এবং ছোটো টিনের বাক্সে শুকনোজাতের খাবার। একটা ওডিকলোনের শিশি বিশেষ দৃষ্টিগোচররূপেই রাখা থাকে, যদি মাথা ধরে। গাড়ি ফিরে এলে পরীক্ষা ক'রে দেখে কোনোটাই ব্যবহার করা হয়নি। মন খারাপ হয়ে যায়। সাফ কাপড় শোবার ঘরে প্রত্যহই সুপ্রকাশ্য-ভাবে ভাঁজ করা, তৎসত্ত্বেও অন্তত সপ্তাহে চারদিন কাপড় ছাড়বার অবকাশ থাকে না। ঘরকন্নার পরামর্শ খুবই খাটো ক'রে আনতে হয়েছে, জরুরি টেলিগ্রামের ঠোকর-মারা ভাষার ধরনে, সেও চলতে চলতে পিছু ডাকতে ডাকতে, বলতে বলতে, "ওগো শুনে যাও কথাটা।" ওদের ব্যবসার মধ্যে শর্মিলার যে একটুখানি যোগ ছিল তাও গেল কেটে, ওর টাকাটা এসেছে সুদে

আসলে শোধ হয়ে। সুদও দিয়েছে মাপজোখ করা হিসেবে, দস্তুরমতো রসিদ নিয়ে। শর্মিলা বলে, "বাস্‌রে, ভালোবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলাতে পারে না। একটা জায়গা ফাঁকা রাখে, সেইখানটাতে ওদের পৌরুষের অভিমান।"

লাভের টাকা থেকে শশাঙ্ক মনের মতো বাড়ি খাড়া করেছে ভবানীপুরে। ওর শখের জিনিস। স্বাস্থ্য আরাম শৃঙ্খলার নতুন নতুন প্ল্যান আসছে মাথায়। শর্মিলাকে আশ্চর্য করবার চেষ্টা। শর্মিলাও বিধি-মতো আশ্চর্য হোতে ত্রুটি করে না। এঞ্জিনিয়ার একটা কাপড়-কাচা কলের পত্তন করেছে, শর্মিলা সেটাকে ঘুরে ফিরে দেখে খুব তারিফ করলে। মনে মনে বললে, "কাপড় আজও যেমন ধোবার বাড়ি যাচ্ছে কালও তেমনি যাবে। ময়লা কাপড়ের গর্দভবাহনকে বুঝে নিয়েছি, তার বিজ্ঞানবাহনকে বুঝিনে।" আলুর খোসা ছাড়াবার যন্ত্রটা দেখে তাক লেগে গেল, বললে, "আলুর দম তৈরি করবার বারো আনা দুঃখ যাবে কেটে।" পরে শোনা গেছে সেটা ফুটো ডেকচি ভাঙা কাতলি প্রভৃতির সঙ্গে এক বিস্মৃতিশয্যায় নৈষ্কর্ম্য লাভ করেছে।

বাড়িটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন এই স্থাবর পদার্থটার প্রতি শর্মিলার রুদ্ধ স্নেহের উদ্যম ছাড়া পেলে। সুবিধা এই যে ইঁটকাঠের দেহটাতে ধৈর্য অটল। গোছানোগাছানো সাজানোগোজানোর মহোদ্যমে দুই-দুই জন বেহারা হাঁপিয়ে উঠল, একজন দিয়ে গেল জবাব। ঘরগুলোর গৃহসজ্জা চলছে শশাঙ্ককে লক্ষ্য ক'রে। বৈঠকখানাঘরে সে আজকাল প্রায়ই বসে না তবু তারি ক্লান্ত মেরুদণ্ডের উদ্দেশে কুশন নিবেদন করা হচ্ছে নানা ফ্যাশনের; ফুলদানি একটা-আধটা নয়, টিপায়ে টেবিলে ঝালরওআলা ফুলকাটা আবরণ। শোবার ঘরে দিনের বেলায় শশাঙ্কর সমাগম আজকাল বন্ধ, কেননা তার আধুনিক পঞ্জিকায় রবিবারটা সোমবারেরই যমজ ভাই। অন্য ছুটিতে কাজ যখন বন্ধ তখনও ছুটোছাটা কাজ কোথা থেকে সে খুঁজে বের করে, আপিস ঘরে গিয়ে প্ল্যান আঁকবার তেলা কাগজ কিংবা খাতাপত্র নিয়ে বসে। তবু সাবেক কালের নিয়ম চলছে। মোটা গদিওআলা সোফার সামনে প্রস্তুত থাকে পশমের চটি জোড়া। সেখানে পানের বাটায় আগেকার মতোই পান থাকে সাজা, আলনায় থাকে পাতলা সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচানো

ধুতি। আপিসঘরটাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসের দরকার, তবু শশাঙ্কের অনুপস্থিতিকালে ঝাড়ন হাতে শর্মিলা সেখানে প্রবেশ করে। সেখানকার রক্ষণীয় এবং বর্জনীয় বস্তুব্যূহের মধ্যে সজ্জা ও শৃঙ্খলার সমন্বয় সাধনে তার অধ্যবসায় অপ্রতিহত।

শর্মিলা সেবা করছে, কিন্তু আজকাল সেই সেবার অনেকখানি অগোচরে। আগে তার যে আত্মনিবেদন ছিল প্রত্যক্ষের কাছে, এখন তার প্রয়োগটা প্রতীকে,—বাড়িঘর সাজানোয়, বাগান করায়, যে চৌকিতে শশাঙ্ক বসে তারই রেশমের ঢাকায়, বালিশের ওআড়ের ফুলকাটা কাজে, আপিসের টেবিলের কোণে রজনীগন্ধার গুচ্ছে সজ্জিত নীল স্ফটিকের ফুলদানিতে।

নিজের অর্ঘ্যকে পূজাবেদির থেকে দূরে স্থাপন করতে হোলো, কিন্তু অনেক দুঃখে। এই অল্পদিন আগেই যে ঘা পেয়েছে তার চিহ্ন গোপনে চোখের জল ফেলে ফেলে মুছতে হয়েছে। সেদিন উনত্রিশে কার্তিক, শশাঙ্কের জন্মদিন। শর্মিলার জীবনে সবচেয়ে বড়ো পরব। যথারীতি বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হোলো, ঘরদুয়োর বিশেষ ক'রে সাজানো হয়েছে ফুলে পাতায়।

সকালের কাজ সেরে শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে এসে বললে, "এ কী ব্যাপার। পুতুলের বিয়ে নাকি।"

"হায়রে কপাল, আজ তোমার জন্মদিন, সে কথাটাও ভুলে গেছ? যাই বলো বিকেলে কিন্তু তুমি বেরোতে পারবে না।"

"বিজ্‌নেস্‌ মৃত্যুদিন ছাড়া আর কোনো দিনের কাছে মাথা হেঁট করে না।"

"আর কখনো বলব না। আজ লোকজন নেমন্তন্ন করে ফেলেছি।"

"দেখো শর্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করবার চেষ্টা কোরো না" এই ব'লে শশাঙ্ক দ্রুত চলে গেল। শর্মিলা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে খানিকক্ষণ কাঁদলে।

অপরাহ্নে লোকজন এল। বিজনেসের সর্বোচ্চ দাবি তারা সহজেই মেনে নিলে। এটা যদি হোত কালিদাসের জন্মদিন তবে শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্ক লেখবার ওজরটাকে সকলেই নিশ্চয় নিতান্ত বাজে ব'লে ধরে নিত। কিন্তু বিজনেস! আমোদপ্রমোদ যথেষ্ট হোলো। নালুবাবু থিয়েটারের নকল ক'রে সবাইকে খুব হাসালেন, শর্মিলাও সে হাসিতে যোগ দিলে।

শশাঙ্ক-বিরহিত শশাঙ্কের জন্মদিন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলে শশাঙ্ক-অধিষ্ঠিত বিজনেসের কাছে।

দুঃখ যথেষ্ট হোলো তবু শর্মিলার মনও দূর থেকে প্রণিপাত করলে শশাঙ্কের এই ধাবমান কাজের রথের ধ্বজাটাকে। ওর কাছে সেই দুরধিগম্য কাজ, যা কারো খাতির করে না, স্ত্রীর মিনতিকে না, বন্ধুর নিমন্ত্রণকে না, নিজের আরামকে না। এই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা পুরুষমানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করে, এ তার আপন শক্তির কাছে আপনাকে নিবেদন। শর্মিলা ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কর্মধারার পারে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখে তার পরপারে শশাঙ্কের কাজ। বহুব্যাপক তার সত্তা, ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় সে দূরদেশে, দূর সমুদ্রের পারে, জানা অজানা কত লোককে টেনে নিয়ে আসে আপন শাসনজালে। নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম; তারই বন্ধুর যাত্রাপথে মেয়েদের কোমল বাহুবন্ধন যদি বাধা ঘটাতে আসে তবে পুরুষ তাকে নির্মম বেগে ছিন্ন ক'রে যাবে বই কি। এই নির্মমতাকে শর্মিলা ভক্তির সঙ্গেই মেনে নিলে। মাঝে মাঝে থাকতে পারে না, যেখানে অধিকার নেই হৃদয়ের টানে সেখানেও নিয়ে আসে তার সকরুণ উৎকণ্ঠা,

আঘাত পায়, সে আঘাতকে প্রাপ্য গণ্য ক'রেই ব্যথিত মনে পথ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে। দেবতাকে বলে, দৃষ্টি রেখো, যেখানে তার নিজের গতিবিধি অবরুদ্ধ।

নীরদ

ব্যাঙ্কে-জমা টাকায় সওয়ার হয়ে এ পরিবারের সমৃদ্ধি যে-সময়টাতে ছুটে চলেছে ছয় সংখ্যার অঙ্কের দিকে, সেই সময়েই শর্মিলাকে ধরল দুর্বোধ কোন্ এক রোগে, ওঠবার শক্তি রইল না। এ নিয়ে কেন যে দুর্ভাবনা সে কথাটা বিবৃত করা দরকার।

রাজারামবাবু ছিলেন শর্মিলার বাপ। বরিশাল অঞ্চলে এবং গঙ্গার মোহানার কাছে তাঁর অনেকগুলি মস্ত জমিদারি। তা ছাড়া জাহাজ তৈরির ব্যবসায়ে তাঁর শেয়ার আছে শালিমারের ঘাটে। তাঁর জন্ম সেকালের সীমানায় একালের শুরুতে। কুস্তিতে শিকারে লাঠিখেলায় ছিলেন ওস্তাদ। পাখোয়াজে নাম ছিল প্রসিদ্ধ। মার্চেন্ট অফ ভেনিস, জুলিয়াস সিজার, হ্যামলেট থেকে দুচার পাতা মুখস্থ ব'লে যেতে পারতেন, মেকলের ইংরেজি ছিল তাঁর আদর্শ, বার্কের বাগ্মিতায় ছিলেন মুগ্ধ, বাংলাভাষায় তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল মেঘনাদবধকাব্য পর্যন্ত। মধ্য বয়সে মদ এবং নিষিদ্ধ ভোজ্যকে আধুনিক চিত্তোৎকর্ষের আবশ্যক অঙ্গ ব'লে জানতেন, শেষবয়সে ছেড়ে দিয়েছেন। সযত্ন ছিল তাঁর পরিচ্ছদ, সুন্দর গম্ভীর ছিল তাঁর মুখশ্রী, দীর্ঘ বলিষ্ঠ

ছিল তাঁর দেহ, মেজাজ ছিল মজলিসি, কোনো প্রার্থী তাঁকে ধ'রে পড়লে 'না' বলতে জানতেন না। নিষ্ঠা ছিল না পূজার্চনায়, অথচ সেটা সমারোহে প্রচলিত ছিল তাঁর বাড়িতে। সমারোহ দ্বারা কৌলিক মর্যাদা প্রকাশ পেত, পূজাটা ছিল মেয়েদের এবং অন্যদের জন্যে; ইচ্ছে করলে অনায়াসে রাজা উপাধি পেতে পারতেন; ঔদাস্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে রাজারাম হেসে বলতেন, পিতৃদত্ত রাজোপাধি ভোগ করছেন, তার উপরে অন্য উপাধিকে আসন দিলে সম্মান খর্ব হবে। গবর্মেণ্ট-হৌসে তাঁর ছিল বিশেষ দেউড়িতে সম্মানিত প্রবেশিকা। কর্তৃপক্ষীয় পদস্থ ইংরেজ তাঁর বাড়িতে চিরপ্রচলিত জগদ্ধাত্রী পূজায় শ্যাম্পেন প্রসাদ ভূরিপরিমাণেই অন্তরস্থ করতেন।

শর্মিলার বিবাহের পরে তাঁর পত্নীহীন ঘরে ছিল বড়ো ছেলে হেমন্ত, আর ছোটো মেয়ে ঊর্মিমালা। ছেলেটিকে অধ্যাপকবর্গ বলতেন দীপ্তিমান, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রিলিয়াণ্ট। চেহারা ছিল পিছন ফিরে চেয়ে দেখবার মতো। এমন বিষয় ছিল না যাতে বিদ্যা না চড়েছে পরীক্ষামানের ঊর্ধ্বতম মার্কা পর্যন্ত। তা ছাড়া ব্যায়ামের উৎকর্ষে বাপের নাম রাখতে পারবে এমন

লক্ষণ প্রবল। বলা বাহুল্য তার চারদিকে উৎকণ্ঠিত কন্যামণ্ডলীর কক্ষপ্রদক্ষিণ সবেগে চলছিল, কিন্তু বিবাহে তার মন তখনো উদাসীন। উপস্থিত লক্ষ্য ছিল য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি সংগ্রহের দিকে। সেই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে ফরাসি জর্মন শেখা শুরু করেছিল।

আর কিছু হাতে না পেয়ে অনাবশ্যক হোলেও আইন পড়া যখন আরম্ভ করেছে এমন সময় হেমন্তের অন্ত্রে কিংবা শরীরে কোন্ যন্ত্রে কী একটা বিকার ঘটল ডাক্তারেরা কিছুই তার কিনারা পেলেন না। গোপনচারী রোগ সবল দেহে যেন দুর্গের আশ্রয় পেয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যেমন শক্ত হোলো তাকে আক্রমণ করাও তেমনি। সেকালের এক ইংরেজ ডাক্তারের উপর রাজারামের ছিল অবিচলিত আস্থা। অস্ত্রচিকিৎসায় লোকটি যশস্বী। রোগীর দেহে সন্ধান শুরু করলেন। অস্ত্রব্যবহারের অভ্যাসবশত অনুমান করলেন, দেহের দুর্গম গহনে বিপদ আছে বদ্ধমূল, সেটা উৎপাটনযোগ্য। অস্ত্রের সুকৌশল সাহায্যে স্তর ভেদ ক'রে যেখানটা অনাবৃত হোলো, সেখানে কল্পিত শত্রুও নেই তার অত্যাচারের চিহ্নও নেই। ভুল শোধরাবার রাস্তা

রইল না, ছেলেটি মারা গেল। বাপের মনে বিষম দুঃখ কিছুতেই শান্ত হোতে চাইল না। মৃত্যু তাঁকে তত বাজেনি কিন্তু এমন একটা সজীব সুন্দর বলিষ্ঠ দেহকে এমন ক'রে খণ্ডিত করবার স্মৃতিটা দিনরাত তাঁর মনের মধ্যে কালো হিংস্র পাখির মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইল। মর্মশোষণ ক'রে টানলে তাঁকে মৃত্যুর মুখে।

নতুন পাস-করা ডাক্তার, হেমন্তের পূর্ব সহাধ্যায়ী, নীরদ মুখুজ্জে ছিল শুশ্রূষার সহায়তাকাজে। বরাবর জোর ক'রে সে ব'লে এসেছে, ভুল হচ্ছে। সে নিজে ব্যামোর একটা স্বরূপ নির্ণয় করেছিল, পরামর্শ দিয়েছিল দীর্ঘকাল শুকনো জায়গায় হাওয়া বদল করতে। কিন্তু রাজারামের মনে তাঁদের পৈত্রিক যুগের সংস্কার ছিল অটল। তিনি জানতেন যমের সঙ্গে দুঃসাধ্য লড়াই বাধলে তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র ইংরেজ ডাক্তার। এই ব্যাপারে নীরদের 'পরে অযথা-মাত্রায় তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাঁর ছোটো মেয়ে উর্মির অকস্মাৎ মনে হোলো, এ মানুষটার প্রতিভা অসামান্য। বাবাকে বললে, "দেখো তো বাবা, অল্প বয়স অথচ নিজের 'পরে কী দৃঢ় বিশ্বাস, আর অতবড়ো

হাড়-চওড়া বিলিতি ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে নিজের মতকে নিঃসংশয়ে প্রচার করতে পারে এমন অসংকুচিত সাহস।"

বাবা বললেন, "ডাক্তারি বিদ্যে কেবল শাস্ত্রগত নয়। কারো কারো মধ্যে থাকে ওটার দুর্লভ দৈব সংস্কার। নীরদের দেখছি তাই।"

এদের ভক্তির শুরু হোলো একটা ছোটো প্রমাণ নিয়ে, শোকের আঘাতে, পরিতাপের বেদনায়; তার পরে প্রমাণের অপেক্ষা না ক'রে সেটা আপনিই বেড়ে চলল।

রাজারাম একদিন মেয়েকে বললেন, "দেখ্ ঊর্মি, আমি যেন শুনতে পাই, হেমন্ত আমাকে কেবলি ডাকছে, বলছে মানুষের রোগের দুঃখ দূর করো। স্থির করেছি তার নামে একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করব।"

ঊর্মি তার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "খুব ভালো হবে। আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো য়ুরোপে, ডাক্তারি শিখে ফিরে এসে যেন হাসপাতালের ভার নিতে পারি।"

কথাটা রাজারামের হৃদয়ে গিয়ে লাগল। বললেন, "ঐ হাসপাতাল হবে দেবত্র সম্পত্তি, তুই হবি

সেবায়েত। হেমন্ত বড়ো দুঃখ পেয়ে গেছে, তোকে সে বড়ো ভালোবাসত, তোর এই পুণ্যকাজে পরলোকে সে শান্তি পাবে। তার রোগশয্যায় তুই তো দিনরাত্রি তার সেবা করেছিস, সেই সেবাই তোর হাতে আরো বড়ো হয়ে উঠবে।" বনেদি ঘরের মেয়ে ডাক্তারি করবে এটাও সৃষ্টিছাড়া ব'লে বৃদ্ধের মনে হোলো না। রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো বলতে যে কতখানি বোঝায় আজ সেটা আপন মর্মের মধ্যে বুঝেছেন। তাঁর ছেলে বাঁচেনি কিন্তু অন্যের ছেলেরা যদি বাঁচে তাহলে যেন তার ক্ষতিপূরণ হয়, তাঁর শোকের লাঘব হোতে পারে। মেয়েকে বললেন, "এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে বিজ্ঞানের শিক্ষাটা শেষ হয়ে যাক আগে, তার পরে য়ুরোপে।"

এখন থেকে রাজারামের মনে একটা কথা ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে ঐ নীরদ ছেলেটির কথা। একেবারে সোনার টুকরো। যত দেখছেন ততই লাগছে চমৎকার। পাস করেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষার তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারি বিদ্যের সাতসমুদ্রে দিনরাত সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। অল্প বয়েস, অথচ আমোদপ্রমোদ কোনো কিছুতে টলে না মন[illegible]লের

যত কিছু আবিষ্কার তাই আলোচনা করছে উলটে পালটে, পরীক্ষা করছে, আর ক্ষতি করছে নিজের পসারের। অত্যন্ত অবজ্ঞা করছে তাদের যাদের পসার জমেছে। বলত, মূর্খেরা লাভ করে উন্নতি, যোগ্যব্যক্তিরা লাভ করে গৌরব। কথাটা সংগ্রহ করেছে কোনো একটা বই থেকে।

অবশেষে একদিন রাজারাম ঊর্মিকে বললেন, "ভেবে দেখলুম, আমাদের হাসপাতালে তুই নীরদের সঙ্গিনী হয়ে কাজ করলেই কাজটা সম্পূর্ণ হবে আর আমিও নিশ্চিন্ত হোতে পারব। ওর মতো অমন ছেলে পাব কোথায়।"

রাজারাম আর যাই পারুন হেমন্তের মতকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। সে বলত মেয়ের পছন্দ উপেক্ষা ক'রে বাপমায়ের পছন্দে বিবাহ ঘটানো বর্বরতা। রাজারাম একদা তর্ক করেছিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিগত নয়, তার সঙ্গে সংসার জড়িত, তাই বিবাহে শুধু ইচ্ছার দ্বারা নয় অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হওয়ার দরকার আছে। তর্ক যেমনি করুন অভিরুচি যেমনি থাক্ হেমন্তের 'পরে তাঁর স্নেহ এত গভীর যে তার ইচ্ছাই এ পরিবারে জয়ী হোলো।

নীরদ মুখুজ্যের এ বাড়িতে গতিবিধি ছিল। হেমন্ত ওর নাম দিয়েছিল আউল, অর্থাৎ প্যাঁচা। অর্থ ব্যাখ্যা করতে বললে সে বলত, ও মানুষটা পৌরাণিক, মাইথলজিকাল, ওর বয়েস নেই কেবল আছে বিদ্যে, তাই আমি ওকে বলি মিনার্ভার বাহন।

নীরদ এদের বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেয়েছে, হেমন্তর সঙ্গে তুমুল তর্ক চালিয়েছে, মনে মনে ঊর্মিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে কিন্তু ব্যবহারে করেনি যে তার কারণ, এক্ষেত্রে যথোচিত ব্যবহারটাই ওর স্বভাবে নেই। ও আলোচনা করতে পারে আলাপ করতে জানে না। যৌবনের উত্তাপ ওর মধ্যে যদি বা থাকে তার আলোটা নেই। এইজন্যেই, যেসব যুবকের মধ্যে যৌবনটা যথেষ্ট প্রকাশমান তাদের অবজ্ঞা ক'রেই ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই সকল কারণে ওকে ঊর্মির উমেদারশ্রেণীতে গণ্য করতে কেউ সাহস করেনি। অথচ সেই প্রতীয়মান নিরাসক্তিই বর্তমান কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওর 'পরে ঊর্মির শ্রদ্ধাকে সম্ভ্রমের সীমায় টেনে এনেছিল।

রাজারাম যখন স্পষ্ট করেই বললেন যে, যদি মেয়ের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে তবে নীরদের সঙ্গে তার

বিবাহ হোলে তিনি খুশি হবেন তখন মেয়ে অনুকূল ইঙ্গিতেই মাথাটা নাড়লে। কেবল সেই সঙ্গে জানালে, এ দেশের এবং বিলেতের শিক্ষার পালা সমাধা ক'রে বিবাহ তার পরিণামে। বাবা বললেন, "সেই কথাই ভালো, কিন্তু পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলে, আর কোনো ভাবনা থাকে না।"

নীরদের সম্মতি পেতে দেরি হয়নি, যদিও তার ভাবে প্রকাশ পেল, উদ্বাহবন্ধন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ত্যাগ-স্বীকার, প্রায় আত্মঘাতের কাছাকাছি। বোধ করি, এই দুর্যোগ কথঞ্চিৎ উপশমের উপায় স্বরূপে সর্ত্ত রইল যে পড়াশুনো এবং সকল বিষয়েই নীরদ উর্মিকে পরিচালনা করবে, অর্থাৎ ভাবী পত্নীরূপে ওকে ধীরে ধীরে নিজের হাতে গড়ে তুলবে। সেটাও হবে বৈজ্ঞানিকভাবে, দৃঢ়নিয়ন্ত্রিত নিয়মে, ল্যাবরেটরির অভ্রান্ত প্রক্রিয়ার মতো।

নীরদ উর্মিকে বললে, "পশুপক্ষীরা প্রকৃতির কারখানা থেকে বেরিয়েছে তৈরি জিনিস। কিন্তু মানুষ কাঁচা মালমসলা। স্বয়ং মানুষের উপর ভার তাকে গড়ে তোলা।"

উর্মি নম্রভাবে বললে, "আচ্ছা পরীক্ষা করুন।

বাধা পাবেন না।” নীরদ বললে, “তোমার মধ্যে শক্তি নানাবিধ আছে। তাদের বেঁধে তুলতে হবে তোমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্যের চারিদিকে। তাহলেই তোমার জীবন অর্থ পাবে। বিক্ষিপ্তকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে একটা অভিপ্রায়ের টানে, আঁট হয়ে উঠবে, ডাইনামিক হবে, তবেই সেই একত্বকে বলা যেতে পারবে মরাল অর্গানিজম্।”

ঊর্মি পুলকিত হয়ে ভাবলে, অনেক যুবক ওদের চায়ের টেবিলে, ওদের টেনিস কোর্টে এসেছে, কিন্তু ভাববার যোগ্য কথা তারা কখনো বলে না, আর-কেউ বললে হাই তোলে। বস্তুত নিরতিশয় গভীরভাবে কথা বলবার একটা ধরন আছে নীরদের। সে যাই বলুক ঊর্মির মনে হয় এর মধ্যে একটা আশ্চর্য তাৎপর্য আছে। অত্যন্ত বেশি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল।

রাজারাম ওঁর বড়ো জামাইকেও ডাকলেন। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে চেষ্টা করলেন পরস্পরকে ভালো ক’রে আলাপ করিয়ে দেবার। শশাঙ্ক শর্মিলাকে বলে, “ছেলেটা অসহ্য জ্যাঠা, ও মনে করে আমরা সবাই ওর ছাত্র, তাও পড়ে আছি শেষ বেঞ্চির শেষ কোণে।”

শর্মিলা হেসে বলে, "ওটা তোমার জেলাসি। কেন, আমার তো ওকে বেশ লাগে।"

শশাঙ্ক বলে, "ছোটো বোনের সঙ্গে ঠাঁই বদল করলে কেমন হয়।" শর্মিলা বলে, "তাহলে তুমি হয়তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচো, আমার কথা আলাদা।"

শশাঙ্কের প্রতি নীরদেরও যে ভ্রাতৃভাব বেড়ে উঠছে তা মনে হয় না। মনে মনে বলে, "ও তো মজুর, ও কি বৈজ্ঞানিক। হাত আছে মাথাটা কই।"

শশাঙ্ক নীরদকে নিয়ে তার শ্যালীকে প্রায় ঠাট্টা করে। বলে, "এবার পুরোনো নাম বদলাবার দিন এল।"

"ইংরেজি মতে?"

"না বিশুদ্ধ সংস্কৃত মতে।"

"নতুন নামটা শুনি।"

"বিদ্যুৎলতা। নীরদের পছন্দ হবে। ল্যাবরেটরিতে ঐ পদার্থটার সঙ্গে পরিচয় আছে এবার ঘরে পড়বে বাঁধা।"

মনে মনে বলে, "সত্যি ঐ নামটাই একে ঠিক মানায় বটে।" ভিতরে ভিতরে একটা খোঁচা লাগে। "হায়রে, এতবড়ো স্প্রিংটার হাতে পড়বে এমন

মেয়ে।”—কার হাতে পড়লে যে শশাঙ্কের রুচিতে ঠিক সন্তোষজনক এবং সান্ত্বনাজনক হোতে পারত বলা শক্ত।

অল্পদিনের মধ্যে রাজারামের মৃত্যু হোলো। ঊর্মির ভাবী স্বত্বাধিকারী নীরদনাথ একাগ্রমনে তার পরিণতি সাধনের ভার নিলে।

ঊর্মিমালা যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার চঞ্চল দেহে মনের উজ্জ্বলতা ঝলমল করে বেড়ায়। সকল বিষয়েই তার ঔৎসুক্য। সায়ান্সে যেমন তার মন, সাহিত্যে তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে তার অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদেশ থেকে এসেছে ফিজিক্সের ব্যাখ্যাকর্তা, সে সভাতেও সে উপস্থিত। রেডিওতে কান পাতে, হয়তো বলে, ছ্যাঃ, কিন্তু কৌতূহলও যথেষ্ট। বিয়ে করতে রাস্তা দিয়ে বর চলেছে বাজনা বাজিয়ে, ও ছুটে আসে বারান্দায়। জুওলজিকালে বারে বারে বেড়িয়ে আসে, ভারি আমোদ লাগে, বিশেষত বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে। বাবা যখন মাছ ধরতে যেতেন ছিপ নিয়ে ও তাঁর পাশে গিয়ে বসত। টেনিস খেলে, ব্যাড-

মিণ্টন খেলায় ওস্তাদ। এসব দাদার কাছে শিক্ষা। তন্বী সে সঞ্চারিণী লতার মতো, একটু হাওয়াতেই দুলে ওঠে। সাজসজ্জা সহজ এবং পরিপাটি। জানে কেমন ক'রে শাড়িটাতে এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনে টুনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঢিল দিয়ে আঁট ক'রে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়, অথচ তার রহস্যভেদ করা যায় না। গান ভালো গাইতে জানে না কিন্তু সেতার বাজায়। সেই সংগীত দেখবার না শোনবার কে জানে। মনে হয় ওর দুরন্ত আঙুলগুলি কোলাহল করছে। কথা কবার বিষয়ের অভাব ঘটে না কখনো, হাসবার জন্যে সংগত কারণের অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গ দান করবার অজস্র ক্ষমতা, যেখানে থাকে সেখানকার ফাঁক ও একলা ভরিয়ে রাখে। কেবল নীরদের কাছে ও হয়ে যায় আর-এক মানুষ, পালের নৌকোর হাওয়া যায় বন্ধ হয়ে, গুণের টানে চলে নম্রমন্থর গমনে।

সবাই বলে ঊর্মির স্বভাব ওর ভাইয়েরই মতো প্রাণপরিপূর্ণ। ঊর্মি জানে ওর ভাই ওর মনকে মুক্তি দিয়েছে। হেমন্ত বলত, আমাদের ঘরগুলো এক-একটা ছাঁচ, মাটির মানুষ গড়বার জন্যেই। তাই তো এতকাল ধরে বিদেশী বাজিকর এত সহজে তেত্রিশকোটি পুতুলকে

নাচিয়ে বেড়িয়েছে। সে বলত, "আমার যখন সময় আসবে, তখন এই সামাজিক পৌত্তলিকতা ভাঙবার জন্যে কালাপাহাড়ি করতে বেরোব।" সময় হোলো না কিন্তু উর্মির মনকে খুবই সজীব ক'রে রেখে দিয়ে গেছে।

মুশকিল বাধল এই নিয়ে। নীরদের কার্যপ্রণালী অত্যন্ত বিধিবদ্ধ। উর্মির জন্যে পাঠ্যপর্যায়ের বাঁধা নিয়ম করে দিলে। ওকে উপদেশ দিয়ে বললে, "দেখো উর্মি, মনটাকে পথে চলতে চলতে কেবলি চলকিয়ে ফেলো না, পথের শেষে যখন পৌঁছবে তখন ঘড়াটাতে বাকি থাকবে কী।"

বলত, "তুমি প্রজাপতির মতো, চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াও, কিছুই সংগ্রহ ক'রে আনো না। হোতে হবে মৌমাছির মতো। প্রত্যেক মুহূর্তের হিসেব আছে। জীবনটা তো বিলাসিতা নয়।"

নীরদ সম্প্রতি ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরি থেকে শিক্ষা-তত্ত্বর বই আনিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে, তাতে এই রকম সব কথা আছে। ওর ভাষাটা বইয়ের ভাষা, কেননা, ওর নিজের সহজ ভাষা নেই। উর্মির সন্দেহ

রইল না যে সে অপরাধী। মহৎ ব্রত তার, অথচ তার থেকে কথায় কথায় মন আশেপাশে চলে যায়, নিজেকে কেবলি লাঞ্ছিত করে। সামনেই দৃষ্টান্ত রয়েছে নীরদের; কী আশ্চর্য দৃঢ়তা, কী একাগ্র লক্ষ্য, সকল প্রকার আমোদ-আহ্লাদের প্রতি কী কঠোর বিরুদ্ধতা। উর্মির টেবিলে গল্প কিংবা হালকা সাহিত্যের কোনো বই যদি দেখে তবে তখনি সেটা বাজেয়াপ্ত করে দেয়। একদিন বিকেলবেলায় উর্মির তদারক করতে এসে শুনলে সে গেছে ইংরেজি নাট্যশালায় সালিভ্যানের মিকাডো অপেরার বৈকালিক অভিনয় দেখবার জন্যে। তার দাদা থাকতে এরকম সুযোগ প্রায় বাদ যেত না। সেদিন নীরদ তাকে যথোচিত তিরস্কার করেছিল। অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে ইংরেজি ভাষায় বলেছিল, "দেখো, তোমার দাদার মৃত্যুকে সমস্ত জীবন দিয়ে সার্থক করবার ভার নিয়েছ তুমি। এরি মধ্যে কি তা ভুলতে আরম্ভ করেছ।"

শুনে উর্মির অত্যন্ত পরিতাপ লাগল। ভাবলে, "এ মানুষটার কী অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি। শোকস্মৃতির প্রবলতা সত্যিই তো কমে আসছে—আমি নিজে তা বুঝতে পারিনি। ধিক, এত চাপল্য আমার চরিত্রে।" সতর্ক

হোতে লাগল, কাপড়চোপড় থেকে শোভার আভাস পর্যন্ত দূর করলে। শাড়িটা হোলো মোটা, তার রঙ সব গেল ঘুচে। দেরাজের মধ্যে জমা থাকা সত্ত্বেও চকোলেট খাওয়ার লোভটাকে দিলে ছেড়ে। অবাধ্য মনটাকে খুব কষে বাঁধতে লাগল সংকীর্ণ গণ্ডিতে, শুষ্ক কর্তব্যের খোঁটায়। দিদি তিরস্কার করে, শশাঙ্ক নীরদের উদ্দেশে যেসব প্রখর বিশেষণ বর্ষণ করে সেগুলোর ভাষা অভিধানবহির্ভূত উগ্র পরদেশীয়, একটুও সুশ্রাব্য নয়।

একটা জায়গায় নীরদের সঙ্গে শশাঙ্কের মেলে। শশাঙ্কের গাল দেবার আবেগ যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন তার ভাষাটা হয় ইংরেজি, নীরদের যখন উপদেশের বিষয়টা হয় অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ইংরেজিই হয় তার বাহন। নীরদের সবচেয়ে খারাপ লাগে যখন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে ঊর্মি তার দিদির ওখানে যায়। শুধু যায় তা নয়, যাবার ভারি আগ্রহ। ওদের সঙ্গে ঊর্মির যে আত্মীয়সম্বন্ধ সেটা নীরদের সম্বন্ধকে খণ্ডিত করে।

নীরদ মুখ গম্ভীর ক'রে একদিন ঊর্মিকে বললে, "দেখো ঊর্মি, কিছু মনে কোরো না। কী করব বলো,

তোমার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব আছে তাই কর্তব্যবোধে অপ্রিয়কথা বলতে হয়। আমি তোমাকে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, শশাঙ্কবাবুদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা তোমার চরিত্র গঠনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। আত্মীয়তার মোহে তুমি অন্ধ, আমি কিন্তু দুর্গতির সম্ভাবনা সমস্তই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

উর্মির চরিত্র বললে যে-পদার্থটা বোঝায় অন্তত তার প্রথম বন্ধকি দলিল নীরদেরই সিন্ধুকে, সেই চরিত্রের কোথাও কিছু হেরফের হোলে লোকসান নীরদেরই। নির্বন্ধের ফলে ভবানীপুর অঞ্চলে উর্মির গতিবিধি আজকাল নানাপ্রকার ছুতোয় বিরল হয়ে এসেছে। উর্মির এই আত্মশাসন মস্ত একটা ঋণ-শোধের মতো। ওর জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নীরদ যে চিরদিনের মতো নিজের সাধনাকে ভারাক্রান্ত করেছে, বিজ্ঞানতপস্বীর পক্ষে তার চেয়ে আত্ম-অপব্যয় আর কী হোতে পারে।

নানা আকর্ষণ থেকে মনকে প্রতিসংহার করবার দুঃখটা উর্মির একরকম ক'রে সয়ে আসছে। তবুও থেকে থেকে একটা বেদনা মনে দুর্বার হয়ে ওঠে, সেটাকে চঞ্চলতা ব'লে সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে না।

নীরদ ওকে কেবল চালনাই করে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে ওর সাধনা করে না কেন। এই সাধনার জন্যে ওর মন অপেক্ষা করে থাকে,— এই সাধনার অভাবেই ওর হৃদয়ের মাধুর্য পূর্ণ বিকাশের দিকে পৌঁছয় না, ওর সকল কর্তব্য নির্জীব নীরস হয়ে পড়ে। এক-একদিন হঠাৎ মনে হয় যেন নীরদের চোখে একটা আবেশ এসেছে, যেন দেরি নেই, প্রাণের গভীরতম রহস্য এখনি ধরা পড়বে। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, সেই গভীরের বেদনা যদি বা কোথাও থাকে তার ভাষা নীরদের জানা নেই। বলতে পারে না ব'লেই বলবার ইচ্ছাকে সে দোষ দেয়। বিচলিত চিত্তকে মূক রেখেই সে যে চলে আসে এটাকে সে আপন শক্তির পরিচয় ব'লে মনে গর্ব করে। বলে সেন্টিমেণ্টালিটি করা আমার কর্ম নয়। ঊর্মির সেদিন কাঁদতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এমনি তার দশা যে সেও ভক্তিভরে মনে করে একেই বলে বীরত্ব। নিজের দুর্বল মনকে তখন নিষ্ঠুর ভাবে নির্যাতন করতে থাকে। যত চেষ্টাই করুক না কেন, মাঝে মাঝে একথা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একদিন প্রবল শোকের মুখে যে কঠিন কর্তব্য নিজের ইচ্ছায় সে গ্রহণ করেছিল, কালক্রমে নিজের

সেই ইচ্ছা দুর্বল হয়ে আসাতে অন্যের ইচ্ছাকেই আঁকড়ে ধরেছে।

নীরদ ওকে স্পষ্ট করেই বলে, "দেখো ঊর্মি, সাধারণ মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যে-সব স্তবস্তুতি প্রত্যাশা করে আমার কাছে তা পাবার সম্ভাবনা নেই এ কথা জেনে রেখো। আমি তোমাকে যা দেব তা এই সব বানানো কথার চেয়ে সত্য, ঢের বেশি মূল্যবান।"

ঊর্মি মাথা হেঁট ক'রে চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে, এঁর কাছে কি কোনো কথাই লুকোনো থাকবে না।

কিছুতে মন বাঁধতে পারে না। ছাদের উপর একলা বেড়াতে যায়। অপরাহ্নের আলো ধূসর হয়ে আসে। শহরের উঁচুনিচু নানা আকারের বাড়ির চূড়া পেরিয়ে সূর্য অস্ত যায় দূর গঙ্গার ঘাটে জাহাজগুলোর মাস্তুলের পরপ্রান্তে। নানা রঙের লম্বা লম্বা মেঘের রেখা বেড়া তুলে দেয় দিনের প্রান্তসীমানায়। ক্রমে বেড়া যায় লুপ্ত হয়ে। চাঁদ উঠে আসে গির্জের শিখরের ঊর্ধ্বে; অনতিস্ফুট আলোতে শহর হয়ে আসে স্বপ্নের মতো, যেন অলৌকিক মায়াপুরী। মনে প্রশ্ন ওঠে, সত্যই কি জীবনটা এত অবিচলিত কঠিন। আর সে কি এত

কৃপণ। সে না দেবে ছুটি, না দেবে রস। হঠাৎ মনটা খেপে ওঠে, ইচ্ছে করে অত্যন্ত একটা দুষ্টুমি করতে, চেঁচিয়ে বলতে, আমি কিচ্ছু মানিনে।

নীরদ রিসার্চের যে কাজ নিয়েছিল সেটা সমাপ্ত হোলো। য়ুরোপের কোনো বৈজ্ঞানিকসমাজে লেখাটা পাঠিয়ে দিলে। তারা প্রশংসা করলে তার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্কলারশিপ জুটল,— স্থির করলে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নেবার জন্যে সমুদ্রে পাড়ি দেবে।

বিদায় নেবার সময় কোনো করুণ আলাপ হোলো না। কেবল এই কথাটাই বারবার ক'রে বললে যে, "আমি চলে যাচ্ছি, এখন তোমার কর্তব্য সাধনে শৈথিল্য করবে এই আমার আশঙ্কা।" ঊর্মি বললে, "কোনো ভয় করবেন না।" নীরদ বললে, "কী রকম ভাবে চলতে হবে, পড়াশুনো করতে হবে তার একটা বিস্তৃত নোট দিয়ে যাচ্ছি।"

ঊর্মি বললে, "আমি ঠিক সেই অনুসারেই চলব।"

"তোমার ঐ আলমারির বইগুলি কিন্তু আমি আমার বাসায় নিয়ে গিয়ে বন্ধ ক'রে রাখতে চাই।"

"নিয়ে যান" ব'লে ঊর্মি চাবি দিল তার হাতে। সেতারটার দিকে একবার নীরদের চোখ পড়েছিল। দ্বিধা ক'রে থেমে গেল।

অবশেষে নিতান্তই কর্তব্যের অনুরোধে নীরদকে বলতে হোলো, "আমার কেবল একটা ভয় আছে, শশাঙ্কবাবুদের ওখানে আবার যদি তোমার যাতায়াত ঘন ঘন হোতে থাকে তাহলে তোমার নিষ্ঠা যাবে দুর্বল হয়ে, কোনো সন্দেহ নেই। মনে কোরো না, আমি শশাঙ্কবাবুকে নিন্দা করি। উনি খুবই ভালো লোক। ব্যবসায়ে ও-রকম উৎসাহ ও-রকম বুদ্ধি কম বাঙালীর মধ্যেই দেখেছি। ওঁর একমাত্র দোষ এই যে, উনি কোনো আইডিয়ালকেই মানেন না। সত্যি বলছি, ওঁর জন্যে অনেক সময়ই আমার ভয় হয়।"

এর থেকে শশাঙ্কের অনেক দোষের কথাই উঠল এবং যেসব দোষ আজ ঢাকা পড়ে আছে সেগুলো বয়সের সঙ্গে একে একে প্রবল আকারে প্রকাশ হয়ে পড়বে এই অত্যন্ত শোচনীয় দুর্ভাবনার কথা নীরদ চেপে রাখতে পারল না। কিন্তু তা হোক, তবু উনি যে খুব ভালো লোক সে-কথা ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে চায়। সেই সঙ্গে এ-কথাও বলতে চায় ওর সঙ্গদোষ থেকে ওদের বাড়ির আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানো উর্মির পক্ষে বিশেষ দরকার। উর্মির মন ওদের সমভূমিতে যদি নেবে যায় সেটা হবে অধঃপতন।

উর্মি বললে, "আপনি কেন এত বেশি উদ্‌বিগ্ন হচ্ছেন।"

"কেন হচ্ছি শুনবে? রাগ করবে না?"

"সত্য কথা শোনবার শক্তি আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। জানি সহজ নয় তবু সহ্য করতে পারি।"

"তবে বলি শোনো। তোমার স্বভাবের সঙ্গে শশাঙ্কবাবুর স্বভাবের একটা মিল আছে এ আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি। তাঁর মনটা একেবারে হালকা। সেইটেই তোমাকে ভালো লাগে, ঠিক কিনা বলো।"

উর্মি ভাবে, লোকটা সর্বজ্ঞ নাকি। ভগ্নীপতিকে ওর খুব ভালো লাগে সন্দেহ নেই। তার প্রধান কারণ, শশাঙ্ক হো হো ক'রে হাসতে পারে, উৎপাত করতে জানে, ঠাট্টা করে। আর ঠিকটি জানে উর্মি কোন্ ফুল ভালোবাসে আর কোন্ রঙের শাড়ি।

উর্মি বললে, "হাঁ, আমার ভালো লাগে, সে-কথা সত্যি।" নীরদ বললে, "শর্মিলাদিদির ভালোবাসা স্নিগ্ধগম্ভীর, তাঁর সেবা যেন একটা পুণ্যকর্ম, কখনো কর্তব্য থেকে ছুটি নেন না। তারি প্রভাবে শশাঙ্কবাবু একমনে কাজ করতে শিখেছেন। কিন্তু যেদিন তুমি ভবানীপুরে যাও সেইদিনই ওঁর যেন মুখোশ খ'সে পড়ে,

তোমার সঙ্গে ঝুটোপুটি বেধে যায়, চুলের কাঁটা তুলে নিয়ে খোঁপা এলিয়ে দেন, হাতে তোমার পড়বার বই দেখলে আলমারির মাথার উপর রাখেন তুলে। টেনিস খেলবার শখ হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে, হাতে কাজ থাকলেও।"

উর্মিকে মনে মনে মানতেই হোলো যে শশাঙ্কদা এই রকম দৌরাত্ম্য করেন ব'লেই তাঁকে ওর এত ভালো লাগে। ওর নিজের ছেলেমানুষি তাঁর কাছে এলে ঢেউ খেলিয়ে ওঠে। সেও তাঁর 'পরে কম অত্যাচার করে না। দিদি ওদের দুজনের এই দুরন্তপনা দেখে তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ হাসি হাসেন। কখনো বা মৃদু তিরস্কারও করেন কিন্তু সেটা তিরস্কারের ভান।

নীরদ উপসংহারে বললে, "যেখানে তোমার নিজের স্বভাব প্রশ্রয় না পায় সেইখানেই তোমার থাকা চাই। আমি কাছে থাকলে ভাবনা থাকত না, কেননা আমার স্বভাব একেবারে তোমার বিপরীত। তোমার মন রক্ষে করতে গিয়ে তোমার মনকে মাটি করা এ আমার দ্বারা কখনোই হোতে পারত না।"

উর্মি মাথা নিচু ক'রে বললে, "আপনার কথা আমি সর্বদাই স্মরণ রাখব।"

নীরদ বললে, "আমি কতকগুলো বই তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি। তার যেসব চ্যাপ্টারে দাগ দিয়েছি সেইগুলো বিশেষ ক'রে পোড়ো, এর পরে কাজে লাগবে।"

ঊর্মির পক্ষে এই সাহায্যের দরকার ছিল। কেননা ইদানীং মাঝে মাঝে তার মনে কেবলি সন্দেহ আসছিল, ভাবছিল হয়তো প্রথম উৎসাহের মুখে ভুল করেছি। হয়তো ডাক্তারি আমার ধাতের সঙ্গে মিলবে না।

নীরদের দাগ-দেওয়া বইগুলো ওর পক্ষে শক্ত বাঁধনের কাজ করবে, ওকে টেনে নিয়ে চলতে পারবে উজানপথে।

নীরদ চলে গেলে ঊর্মি নিজের প্রতি আরো কঠিন অত্যাচার করলে শুরু। কলেজে যায়, আর বাকি সময় নিজেকে যেন একেবারে জেনেনার মধ্যে বন্ধ করে রাখে। সারাদিন পরে বাড়ি ফিরে এসে যতই তার শ্রান্ত মন ছুটি পেতে চায় ততই সে নিষ্ঠুরভাবে তাকে অধ্যয়নের শিকল জড়িয়ে আটকে রাখে। পড়া এগোয় না, একই পাতার উপর বার বার ক'রে মন বৃথা ঘুরে বেড়ায় তবু

হার মানতে চায় না। নীরদ উপস্থিত নেই ব'লেই তার দূরবর্তী ইচ্ছাশক্তি ওর প্রতি অধিক ক'রে কাজ করতে লাগল।

নিজের উপর সবচেয়ে ধিক্‌কার হয় যখন কাজ করতে করতে আগেকার দিনের কথা কেবলি ফিরে ফিরে মনে আসে। যুবকদলের মধ্যে ওর ভক্ত ছিল অনেক। সেদিন তাদের কাউকে বা উপেক্ষা করেছে, কারো প্রতি ওর মনের টানও হয়েছিল। ভালোবাসা পরিণত হয়নি কিন্তু ভালোবাসার ইচ্ছেটাই তখন মৃদু-মন্দ বসন্তের হাওয়ার মতো মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। তাই আপন মনে গান গাইত গুন্‌ গুন্‌ ক'রে, পছন্দসই কবিতা কপি ক'রে রাখত খাতায়। মন অত্যন্ত উতলা হোলে বাজাত সেতার। আজকাল এক-একদিন সন্ধে-বেলায় বইয়ের পাতায় যখন চোখ আছে তখন হঠাৎ চমকে উঠে' জানতে পারে যে, তার মনে ঘুরছে এমন কোনোদিনের এমন কোনো মানুষের ছবি যে-দিনকে যে-মানুষকে পূর্বে সে কখনোই বিশেষভাবে আমল দেয়নি। এমন কি, সে-মানুষের অবিশ্রাম আগ্রহে সেদিন তাকে বিরক্ত করেছিল। আজ বুঝি তার সেই আগ্রহটাই নিজের ভিতরকার অতৃপ্তির বেদনাকে স্পর্শ

ক'রে ক'রে যাচ্ছে। প্রজাপতির ক্ষণিক হালকা ডানা ফুলকে যেমন বসন্তের স্পর্শ দিয়ে যায়।

এসব চিন্তাকে যত বেগে সে মন থেকে দূর করতে চায় সেই বেগের প্রতিঘাতই চিন্তাগুলিকে ততই ওর মনে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। নীরদের একখানা ফোটো-গ্রাফ রেখেছে ডেস্কের উপর। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, আগ্রহের চিহ্ন নেই। সে ওকে ডাকে না, তবে ওর প্রাণ সাড়া দেবে কা'কে। মনে মনে কেবলি জপ করে, কী প্রতিভা, কী তপস্যা, কী নির্মল চরিত্র, কী আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য।

একটা বিষয়ে নীরদের জিত হয়েছে সে-কথাটাও বলা দরকার। নীরদের সঙ্গে ঊর্মির বিবাহের সম্বন্ধ হোলে শশাঙ্ক এবং সন্দিগ্ধমনা আরো দশজন বিদ্রূপ ক'রে হেসেছিল। বলেছিল, রাজারামবাবু সাদা লোক, ঠাউরে বসেছেন নীরদ আইডিয়ালিস্ট। ওর আইডিয়া-লিজ্‌ম্‌ যে গোপনে ডিম পাড়ছে ঊর্মির টাকার থলির মধ্যে, এ-কথাটা কি লম্বা লম্বা সাধুবাক্য দিয়ে ঢাকা যায়। আপনাকে স্যাক্রিফাইস্‌ করেছে বই কি, কিন্তু যে-দেবতার কাছে, তাঁর মন্দিরটা ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে।

আমরা সোজাসুজি শ্বশুরকে জানিয়ে থাকি, টাকার দরকার আছে, আর সে-টাকা জলে পড়বে না, তাঁরই মেয়ের সেবায় লাগবে। ইনি মহৎ লোক, বলেন মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরেই বিয়ে করবেন। তার পরে সেই উদ্দেশ্যটাকে দিনে দিনে তর্জমা করবেন শ্বশুরের চেক-বইয়ের খাতায়।

নীরদ জানত এইরকম কথাবার্তা অপরিহার্য। ঊর্মিকে বললে, আমার বিয়ে করার একটা শর্ত আছে; তোমার টাকা থেকে এক পয়সা নেব না, নিজের উপার্জন আমার একমাত্র অবলম্বন হবে। শ্বশুর ওকে য়ুরোপে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন, ও কিছুতেই রাজি হোলো না। সেজন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করতেও হোলো। রাজারামবাবুকে জানিয়েছিল, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে যত টাকা দিতে চান সমস্তই দেবেন আপনার মেয়ের নামে। আমি যখন সেই হাসপাতালের ভার নেব তার থেকে কোনো বৃত্তি নেব না। আমি ডাক্তার, জীবিকার জন্যে আমার ভাবনা নেই।

এই একান্ত নিঃস্পৃহতা দেখে ওর 'পরে রাজারামের ভক্তি দৃঢ় হোলো, আর ঊর্মি খুব গর্ব অনুভব করলে। এই গর্বের ন্যায্য কারণ ঘটাতেই শর্মিলার মন নীরদের

'পরে একেবারে বিরূপ হয়ে গেল। বললে, "ঈস্, দেখব দেমাক কতদিন টেঁকে!" তার পর থেকে নীরদ যখন অভ্যাসমতো অত্যন্ত গভীরভাবে কথা কইত শর্মিলা আলাপের মাঝখানে হঠাৎ উঠে' প'ড়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যেত। কিছুদূর পর্যন্ত শোনা যেত তার পায়ের শব্দ। ঊর্মির খাতিরে কিছু বলত না কিন্তু তার না-বলার ব্যঞ্জনা যথেষ্ট তেজোত্তপ্ত ছিল।

প্রথম প্রথম নীরদ প্রতি মেলে চিঠিপত্রে চার-পাঁচ পাতা ধ'রে বিস্তারিত উপদেশ দিয়ে এসেছে। কিছুদিন পরে চমক লাগিয়ে দিলে টেলিগ্রাম। বড়ো অঙ্কের টাকার জরুরী দাবি, অধ্যয়নের প্রয়োজনে। যে গর্ব এতদিন ঊর্মির প্রধান সম্বল ছিল তাতে যথেষ্ট ঘা লাগল বটে কিন্তু মনে একটু সান্ত্বনাও পেলে। যত দিন যায়, এবং নীরদের অনুপস্থিতি দীর্ঘ হয়ে ওঠে, ততই ঊর্মির পূর্ব স্বভাবটা কর্তব্যের বেড়ার মধ্যে ফাঁক খুঁজে বেড়ায়। নিজেকে নানাছলে ফাঁকিও দেয় অনুতাপও করে। এইরকম আত্মগ্লানির সময় নীরদকে অর্থসাহায্য ওর পরিতপ্ত মনের সান্ত্বনাজনক।

ঊর্মি টেলিগ্রামটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে সসংকোচে বলে, "কাকাবাবু, টাকাটা—"

ম্যানেজারবাবু বলেন, "ধাঁধা লাগছে। আমরা তো জানতুম টাকাটা ও-পক্ষে অস্পৃশ্য ছিল।" ম্যানেজার নীরদকে পছন্দ করতেন না।

ঊর্মি বলে, "কিন্তু বিদেশে—" কথাটা শেষ করে না।

কাকাবাবু বলেন, "এদেশের স্বভাব বিদেশের মাটিতে বদলে যেতে পারে সে জানি—কিন্তু আমরা তার সঙ্গে তাল রাখব কী ক'রে।"

ঊর্মি বলে, "টাকাটা না পেলে হয়তো বিপদে পড়তে পারেন।"

"আচ্ছা বেশ, পাঠাচ্ছি মা, তুমি বেশি ভেবো না। ব'লে রাখছি এই শুরু হোলো কিন্তু এই শেষ নয়।"

শেষ যে নয় অনতিকাল পরেই আরো বড়ো অঙ্কে তার প্রমাণ হোলো। এবার প্রয়োজন স্বাস্থ্যের। ম্যানেজার গম্ভীরমুখে বললেন, "শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো।"

ঊর্মি শশব্যস্ত হয়ে বললে, "আর যাই করো, দিদিরা এ-খবরটা যেন না পান।"

"একলা এই দায়িত্ব নিতে ভালো লাগছে না।"

"একদিন তো টাকা তাঁর হাতেই পড়বে।"

"পড়বার আগে দেখতে হবে যেন জলে না পড়ে।"

"কিন্তু ওঁর স্বাস্থ্যের কথা তো ভাবতে হবে।"

"অস্বাস্থ্য নানা জাতের আছে, এটা ঠিক কোন্ জাতের বুঝে উঠতে পারছিনে। এখানে ফিরে এলে হয়তো হাওয়ার বদলে সুস্থ হতে পারেন। ফিরতি প্যাসেজের ব্যবস্থা ক'রে পাঠানো যাক।"

ফেরবার প্রস্তাবে ঊর্মি এত যে বেশি বিচলিত হয়ে উঠল ও নিজে ভাবলে তার কারণ পাছে নীরদের উচ্চ উদ্দেশ্য মাঝখানে বাধা পায়।

কাকা বললেন, "এবারকার মতো টাকা পাঠাচ্ছি কিন্তু মনে হচ্ছে এতে ডাক্তারবাবুর স্বাস্থ্য আরো বিগড়ে যাবে।"

রাধাগোবিন্দ ঊর্মির অনতিদূর সম্পর্কের আত্মীয়। কাকার কথাটার ইঙ্গিত ওকে বাজল। সন্দেহ এল মনে। ভাবতে লাগল, "দিদিকে হয়তো বলতে হবে।" এদিকে নিজেকে ধাক্কা দিয়ে বার বার প্রশ্ন করছে, "যথোচিত দুঃখ হচ্ছে না কেন।"

এই সময়ে শর্মিলার রোগটা নিয়ে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। ভাইয়ের কথা মনে পড়িয়ে ভয় লাগিয়ে

দেয়। নানা ডাক্তার লাগল নানাদিক থেকে ব্যাধির আবাসগুহাটা খুঁজে বের করতে। শর্মিলা ক্লান্ত হাসি হেসে বললে, "সি. আই. ডি.দের হাতে অপরাধী যাবে ফসকে, খোঁচা খেয়ে মরবে নিরপরাধ।"

শশাঙ্ক চিন্তিতমুখে বললে, "দেহটার খানাতল্লাসি চলুক শাস্ত্রমতেই, কিন্তু খোঁচাটা কিছুতেই নয়।"

এই সময়টাতেই শশাঙ্কর হাতে দুটো ভারি কাজ এসেছিল। একটা গঙ্গার ধারে পাটকলে, আর একটা টালিগঞ্জের দিকে, মীরপুরের জমিদারদের নূতন বাগান-বাড়িতে। পাটকলের কুলিবস্তির কাজটা শেষ ক'রে দেবার মেয়াদ ছিল তিন মাসের। গোটাকতক টিউব-ওয়েলেরও কাজ ছিল নানা জায়গায়। শশাঙ্কর একটুও ফুরসুত ছিল না। শর্মিলার ব্যামোটা নিয়ে প্রায় তাকে আটকা পড়তে হয় অথচ উৎকণ্ঠা থাকে কাজের জন্যে।

এতদিন ওদের বিবাহ হয়েছে কিন্তু এমন কোনো ব্যামো শর্মিলার হয়নি যা নিয়ে শশাঙ্ককে কখনো বিশেষ ক'রে ভাবতে হয়েছে। তাই এবারকার এই রোগটার উদ্‌বেগে ছেলেমানুষের মতো ছটফট করছে ওর মন। কাজ কামাই ক'রে ঘুরে ফিরে বিছানার কাছে

নিরুপায়ভাবে এসে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ। তখনি শর্মিলা উত্তর দেয়, "তুমি মিথ্যে ভেবো না, আমি ভালোই আছি।" সেটা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে একান্ত ইচ্ছা ব'লেই শশাঙ্ক অবিলম্বে বিশ্বাস ক'রে ছুটি পায়।

শশাঙ্ক বললে, "ঢেঙ্কানলের রাজার একটা বড়ো কাজ আমার হাতে এসেছে। প্ল্যানটা নিয়ে দেওয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব ডাক্তার আসবার আগেই।"

শর্মিলা অনুযোগ ক'রে বললে, "আমার মাথার দিব্যি রইল তাড়াতাড়ি ক'রে কাজ নষ্ট করতে পারবে না। বুঝতে পারছি ওদের দেশে তোমার যাবার দরকার আছে। নিশ্চয় যেয়ো, না গেলে আমি ভালো থাকব না। আমাকে দেখবার লোক ঢের আছে।"

প্রকাণ্ড একটা ঐশ্বর্য গড়ে তোলবার সংকল্প দিনরাত জাগছে শশাঙ্কের মনে। তার আকর্ষণ ঐশ্বর্যে নয়, বড়োত্বে। বড়ো কিছুকে গড়ে তোলাতেই পুরুষের দায়িত্ব। অর্থ জিনিসটাকে তুচ্ছ ব'লে অবজ্ঞা করা চলে তখনি, যখন তাতে দিনপাত হয় মাত্র। যখন তার চূড়াকে সমুচ্চ ক'রে তোলা যায় তখনি সর্বসাধারণে

তাকে শ্রদ্ধা করে। উপকার পায় ব'লে নয়, তার বড়োত্ব দেখাটাতেই চিত্তস্ফূর্তি। শর্মিলার শিয়রে ব'সে শশাঙ্কর মনে যখন উদ্‌বেগ চলছে সেই মুহূর্তেই সে না ভেবে থাকতে পারে না তার কাজের সৃষ্টিতে অনিষ্টের আশঙ্কা ঘটছে কোন্‌খানে। শর্মিলা জানে শশাঙ্কের এই ভাবনা কৃপণের ভাবনা নয়, নিজের অবস্থার নিম্ন-তল হতে জয়স্তম্ভ ঊর্ধ্বে গেঁথে তোলবার জন্যে পুরুষ-কারের ভাবনা। শশাঙ্কের এই গৌরবে শর্মিলা গৌরবান্বিত। তাই স্বামী যে ওর রোগের সেবা নিয়ে কাজে ঢিল দেবে এ তার পক্ষে সুখের হোলেও ভালোই লাগে না। ওকে বারবার ফিরে পাঠায় তার কাজে।

এদিকে নিজের কর্তব্য নিয়ে শর্মিলার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। সে রইল বিছানায় প'ড়ে, ঠাকুর-চাকররা কী কাণ্ড করছে কে জানে। মনে সন্দেহ নেই যে রান্নায় ঘি দিচ্ছে খারাপ, নাবার ঘরে যথাসময়ে গরম-জল দিতে ভুলেছে, বিছানার চাদর বদল করা হয়নি, নর্দমাগুলোতে মেথরের ঝাঁটা নিয়মিত পড়ছে না। ওদিকে ধোবাবাড়ির কাপড় ফর্দ মিলিয়ে বুঝে না নিলে কী রকম উলোটপালট হয় সে তো জানা আছে। থাকতে পারে না, লুকিয়ে বিছানা ছেড়ে তদন্ত করতে

যায়, বেদনা বেড়ে ওঠে, জ্বর যায় চড়ে, ডাক্তার ভেবে পায় না, এ কী হোলো।

অবশেষে ঊর্মিমালাকে তার দিদি ডেকে পাঠালে। বললে, "কিছুদিন তোর কলেজ থাক্, আমার সংসারটাকে রক্ষা কর্ বোন। নইলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছিনে।"

এই ইতিহাসটা যাঁরা পড়ছেন এই জায়গাটাতে এসে মুচকে হেসে বলবেন, বুঝেছি। বুঝতে অত্যন্ত বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। যা ঘটবার তা-ই ঘটে, আর তা-ই যথেষ্ট। এমনো মনে করবার হেতু নেই ভাগ্যের খেলা চলবে তাসের কাগজ গোপন ক'রে, শর্মিলারই চোখে ধুলো দিয়ে।

দিদির সেবা করতে চলেছি ব'লে ঊর্মির মনে খুবই একটা উৎসাহ হোলো। এই কর্তব্যের খাতিরে অন্য সমস্ত কাজকে সরিয়ে রাখতেই হবে। উপায় নেই। তা ছাড়া এই শুশ্রূষার কাজটা ওর ভাবীকালের ডাক্তারি কাজেরই সংলগ্ন, এ-তর্কও তার মনে এসেছে।

ঘটা ক'রে একটা চামড়া-বাঁধানো নোটবই নিলে। তার মধ্যে রোগের দৈনিক জোয়ারভাঁটার পরিমাণ-টাকে রেখাঙ্কিত করবার ছক কাটা আছে। ডাক্তার

পাছে অনভিজ্ঞ ব'লে অবজ্ঞা করে এইজন্যে স্থির করলে দিদির রোগ সম্বন্ধে যেখানে যা পাওয়া যায় প'ড়ে নেবে। ওর এম. এস.সি. পরীক্ষার একটা বিষয় শারীরতত্ত্ব, এইজন্যে রোগতত্ত্বের পারিভাষিক বুঝতে ওর কষ্ট হবে না।অর্থাৎ দিদির সেবার উপলক্ষ্যে ওর কর্তব্যসূত্র যে ছিন্ন হবে না বরঞ্চ আরো বেশি একান্তমনে কঠিনতর চেষ্টায় তারই অনুসরণ করা হবে এ-কথাটা মনে সে নিশ্চিত ক'রে নিয়ে ওর পড়বার বই আর খাতাপত্র ব্যাগে পুরে ভবানীপুরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হোলো। দিদির ব্যামোটা নিয়ে রোগতত্ত্বসম্বন্ধে মোটা বইটা নাড়াচাড়া করবার সুযোগ ঘটল না। কেননা বিশেষজ্ঞেরাও রোগের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারলে না।

উর্মি ভাবলে, সে শাসনকর্তার কাজ পেয়েছে। তাই সে গম্ভীরমুখে দিদিকে বললে, "ডাক্তারের কথা যাতে খাটে তাই দেখবার ভার আমার উপর, আমার কথা কিন্তু মেনে চলতে হবে আমি তোমাকে ব'লে রাখছি।"

দিদি ওর দায়িত্বের আড়ম্বর দেখে হেসে বললে, "তাই তো, হঠাৎ এত গম্ভীর হোতে শিখলি কোন্ গুরুর কাছে। নতুন দীক্ষা ব'লেই এত বেশি উৎসাহ।

আমারই কথা মেনে চলবি ব'লেই তোকে আমি ডেকেছি। তোর হাসপাতাল তো এখনো তৈরি হয়নি, আমার ঘরকন্না তৈরি হয়েই আছে। আপাতত সেই ভারটা নে, তোর দিদি একটু ছুটি পাক।"

রোগশয্যার কাছ থেকে উর্মিকে জোর ক'রেই দিদি সরিয়ে দিলে।

আজ দিদির গৃহরাজ্যে প্রতিনিধিপদ ওর। সেখানে অরাজকতা ঘটছে, আশু তার প্রতিবিধান চাই। এ সংসারের সর্বোচ্চ শিখরে একটিমাত্র যে পুরুষ বিরাজ করছেন তাঁর সেবায় সামান্য কোনো ত্রুটি না হয়, এই মহৎ উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ত্যাগস্বীকার এই ঘরের ছোটো-বড়ো সমস্ত অধিবাসীর একটিমাত্র সাধনার বিষয়। মানুষটি নিরতিশয় নিরুপায় এবং দেহযাত্রা-নির্বাহে শোচনীয়ভাবে অকর্মণ্য এই সংস্কার কোনো-মতেই শর্মিলার মন থেকে ঘুচতে চায় না। হাসিও পায় অথচ মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে যখন দেখে চুরটের আগুনে ভদ্রলোকের আস্তিন খানিকটা পুড়েছে অথচ লক্ষ্যই নেই। ভোরবেলায় মুখ ধুয়ে শোবার ঘরের কোণের কলটা খুলে রেখে এঞ্জিনিয়র কাজের তাড়ায় দৌড় দিয়েছে বাইরে, ফিরে এসে দেখে মেজে

জলে থৈ থৈ করছে, নষ্ট হয়ে গেল কার্পেটটা। এই জায়গায় কলটা বসাবার সময়ে গোড়াতেই আপত্তি করেছিল শর্মিলা। জানত এই পুরুষটির হাতে বিছানার অদূরে ঐ কোণাটাতে প্রতিদিন জলেস্থলে একটা পঙ্কিল অনাসৃষ্টি বাধবে। কিন্তু মস্ত এঞ্জিনিয়র, বৈজ্ঞানিক সুবিধার দোহাই দিয়ে যতরকম অসুবিধাকে জটিল ক'রে তুলতেই ওর উৎসাহ। খামকা কী মাথায় এল একবার নিজের সম্পূর্ণ ওরিজিনাল প্ল্যানে একটা স্টোভ বানিয়ে বসল। তার এদিকে দরজা, ওদিকে দরজা, এদিকে একটা চোঙ ওদিকে আরেকটা, একদিকে আগুনের অপব্যয়হীন উদ্দীপন, আর একদিকে ঢালু পথে ছাইয়ের নিঃশেষে অধঃপতন—তার পরে সেঁকবার ভাজবার সিদ্ধ করবার জল-গরমের নানা আকারের খোপখাপ গুহাগহ্বর কলকৌশল। কলটাকে উৎসাহের ভঙ্গিতে ও ভাষাতেই মেনে নিতে হয়েছিল, ব্যবহারের জন্যে নয়, শান্তি ও সদ্ভাবরক্ষার জন্যে। প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের এই খেলা! বাধা দিলে অনর্থ বাধে, অথচ দুদিনেই যায় ভুলে। চিরদিনের বাঁধা ব্যবস্থায় মন যায় না, উদ্ভট একটা-কিছু সৃষ্টি করে, আর স্ত্রীদের দায়িত্ব হচ্ছে, মুখে ওদের মতে সায় দেওয়া এবং কাজে নিজের

মতে চলা। এই স্বামীপালনের দায় এতদিন আনন্দে বহন করে এসেছে শর্মিলা।

এতকাল তো কাটল। নিজেকে বিবর্জিত ক'রে শশাঙ্কের জগৎকে শর্মিলা কল্পনাই করতে পারে না। আজ ভয় হচ্ছে মৃত্যুর দূত এসে জগৎ আর জগদ্ধাত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় বুঝি বা। এমন কি ওর আশঙ্কা যে, মৃত্যুর পরেও শশাঙ্কের দৈহিক অযত্ন শর্মিলার বিদেহী আত্মাকে শান্তিহীন করে রাখবে। ভাগ্যে ঊর্মি ছিল। সে ওর মতো শান্ত নয়। তবু ওর হয়ে কাজকর্ম চালিয়ে নিচ্ছে। সে-কাজও তো মেয়েদের হাতের কাজ। ঐ স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ না থাকলে পুরুষদের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনে রস থাকে না যে, সমস্তই যে কী রকম শ্রীহীন হয়ে যায়। তাই ঊর্মি যখন তার সুন্দর হাতে ছুরি নিয়ে আপেলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে রাখে, কমলালেবুর কোওয়া-গুলিকে গুছিয়ে রাখে সাদা পাথরের থালার একপাশে, বেদানা ভেঙে তার দানাগুলিকে যত্ন ক'রে সাজিয়ে দেয় তখন শর্মিলা তার বোনের মধ্যে যেন নিজেকেই উপলব্ধি করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকে সর্বদাই কাজের ফরমাশ করছে—

ওর সিগারেট-কেস্‌টা ভরে দে না ঊর্মি ;

দেখছিসনে ময়লা রুমালটা বদলাবার খেয়াল নেই ;

ঐ দেখ্‌, জুতোটা সিমেণ্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েছে। বেহারাকে সাফ করতে হুকুম করবে তার হুঁশ নেই ;

বালিশের ওয়াড়গুলো বদলে দে না ভাই ;

ফেলে দে ঐ ছেঁড়া কাগজগুলো ঝুড়ির মধ্যে ;

একবার আপিসঘরটা দেখে আসিস তো ঊর্মি, আমি নিশ্চয় বলছি, ওঁর ক্যাশবাক্সের চাবিটা ডেস্কের উপর ফেলে রেখে বেরিয়ে গেছেন।

ফুলকোপির চারাগুলি তুলে পোঁতবার সময় হোলো মনে থাকে যেন ;

মালীকে বলিস, গোলাপের ডালগুলো ছেঁটে দিতে ;

ঐ দেখ্‌ কোটের পিঠেতে চুন লেগেছে—এত তাড়া কিসের, একটু দাঁড়াও না—ঊর্মি, দে তো বোন, বুরুশ ক'রে।

ঊর্মি বই-পড়া মেয়ে, কাজ-করা মেয়ে নয়, তবু ভারি মজা লাগছে। যে কড়া নিয়মের মধ্যে সে ছিল,

তার থেকে বেরিয়ে এসে কাজকর্ম সমস্তই ওর কাছে অনিয়মের মতোই ঠেকছে। এই সংসারের কর্মধারার ভিতরে ভিতরে যে উদ্‌বেগ আছে, সাধনা আছে সে তো ওর মনে নেই; সেই চিন্তার সূত্রটি আছে ওর দিদির মধ্যে। তাই ওর কাছে এই কাজগুলো খেলা, একরকম ছুটি, উদ্দেশ্যবিবর্জিত উদ্‌যোগ। ও যেখানে এতদিন ছিল, এ তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ, এখানে ওর সম্মুখে কোনো লক্ষ্য তর্জনী তুলে নেই, অথচ দিনগুলো কাজ দিয়ে পূর্ণ, সে কাজ বিচিত্র। ভুল হয়, ত্রুটি হয়, তার জন্যে কঠিন জবাবদিহি নেই। যদি বা দিদি একটু তিরস্কার করতে চেষ্টা করে, শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দেয়, যেন উর্মির ভুলটাতেই বিশেষ একটা রস আছে। বস্তুত আজকাল ওদের ঘরকন্নাতে দায়িত্বের গাম্ভীর্য চলে গেছে, ভুলচুকে কিছু আসে যায় না এমন একটা আলগা অবস্থা ঘটেছে; এইটেই শশাঙ্কের কাছে ভারি আরামের ও কৌতুকের। মনে হচ্ছে যেন পিক্‌নিক্ চলছে। আর উর্মি যে কিছুতেই চিন্তিত নয়, দুঃখিত নয়, লজ্জিত নয়, সব-তাতেই উচ্ছ্বসিত, এতে শশাঙ্কের নিজের মন থেকে তার গুরুভার কর্মের পীড়নকে লঘু করে দেয়। কাজ শেষ হোলেই, এমন কি, না হোলেও

বাড়িতে ফিরে আসবার জন্যে ওর মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

এ-কথা মানতেই হবে ঊর্মি কাজে পটু নয়। তবু একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে দেখা গেল কাজ দিয়ে না হোক, নিজেকে দিয়েই, এ বাড়ির অনেকদিনের মস্ত একটা অভাব পূরণ করেছে, সেই অভাবটা ঠিক যে কী তা নির্দিষ্ট ভাষায় বলা যায় না। তাই শশাঙ্ক যখন বাড়িতে আসে তখন সেখানকার হাওয়ায় খেলানো একটা ছুটির হিল্লোল অনুভব করে। সেই ছুটি কেবল ঘরের সেবায় নয়, কেবল অবকাশমাত্রে নয়, তার একটা রসময় স্বরূপ আছে। বস্তুত ঊর্মির নিজের ছুটির আনন্দ এখানকার সমস্ত শূন্যকে পূর্ণ করেছে, দিন-রাত্রিকে চঞ্চল করে রেখেছে। সেই নিরন্তর চাঞ্চল্য কর্মক্লান্ত শশাঙ্কের রক্তকে দোলায়িত করে তোলে। অপর পক্ষে শশাঙ্ক ঊর্মিকে নিয়ে আনন্দিত, সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই ঊর্মিকে আনন্দ দেয়। এতকাল সেই সুখটাই ঊর্মি পায়নি। সে যে আপনার অস্তিত্বমাত্র দিয়ে কাউকে খুশি করতে পারে এই তথ্যটি অনেকদিন তার কাছে চাপা পড়ে গিয়েছিল এতেই তার যথার্থ গৌরবহানি হয়েছিল।

শশাঙ্কের খাওয়াপরা অভ্যাসমতো চলছে কি না, ঠিকসময়ে ঠিক জিনিসের জোগান হোলো কি হোলো না, সেটা এ বাড়ির প্রভুর মনে গৌণ হয়েছে আজ; অমনিতেই অকারণেই আছে প্রসন্ন। শর্মিলাকে সে বলে, "তুমি খুঁটিনাটি নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। অভ্যাসের একটু হেরফের হোলে তো অসুবিধে হয় না, সে তো ভালোই লাগে।"

শশাঙ্কর মনটা এখন জোয়ারভাটার মাঝখানকার নদীর মতো। কাজের বেগটা থমথমে হয়ে এসেছে। একটু কোনো দেরিতেই বা বাধাতেই মুশকিল হবে লোকসান হবে এমনতরো উদ্‌বেগের কথা সদাসর্বদা শোনা যায় না। সে-রকম কিছু প্রকাশ হোলে ঊর্মি তার গাম্ভীর্য ভেঙে দেয়, হেসে ওঠে,—মুখের ভাবখানা দেখে বলে, "আজ তোমার জুজু এসেছিল বুঝি, সেই সবুজ পাগড়ি-পরা কোন্‌-দেশী দালাল—ভয় দেখিয়ে গেছে বুঝি।"

শশাঙ্ক বিস্মিত হয়ে বলে, "তুমি তাকে জানলে কী ক'রে।" "আমি তাকে খুব চিনি। তুমি সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিলে, ও একলা বারান্দায় বসে ছিল।

আমিই তাকে নানা কথা ব'লে ভুলিয়ে রেখেছিলুম। তারি বাড়ি বিকানীয়রে, তার স্ত্রী মরেছে মশারিতে আগুন লেগে, আর একটা বিয়ের সন্ধানে আছে।”

“তাহলে এখন থেকে হিসেব ক'রে সে রোজ আসবে যখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। যতদিন স্ত্রীর ঠিকানা না মেলে ততদিন তার স্বপ্নটা জমবে।”

“আমাকে বলে যেয়ো ওর কাছ থেকে কী কাজ আদায় করতে হবে। ভাব দেখে বোধ হয় আমি পারব।”

আজকাল শশাঙ্কর মুনফার খাতায় নিরেনব্বইয়ের ওপারে যে মোটা অঙ্কগুলো চলৎ অবস্থায়, তারা মাঝে মাঝে যদি একটু সবুর করে সেটাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মতো চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সন্ধ্যাবেলায় রেডিয়োর কাছে কান পাতবার জন্যে শশাঙ্ক মজুমদারের উৎসাহ এতকাল অনভিব্যক্ত ছিল। আজকাল ঊর্মি যখন তাকে টেনে আনে তখন ব্যাপারটাকে তুচ্ছ এবং সময়টাকে ব্যর্থ মনে হয় না। এরোপ্লেন-ওড়া দেখবার জন্যে একদিন ভোরবেলা দমদম পর্যন্ত যেতে হোলো, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তার প্রধান আকর্ষণ নয়। নিউ

মার্কেটে শপিং করতে এই তার প্রথম হাতে-খড়ি। এর আগে শর্মিলা মাঝে মাঝে মাছমাংস ফলমূল শাক-সবজি কিনতে সেখানে যেত। সে জানত এ কাজটা বিশেষভাবে তারই বিভাগের। এখানে শশাঙ্ক যে তার সহযোগিতা করবে এমন কথা সে কখনো মনেও করেনি ইচ্ছেও করেনি। কিন্তু ঊর্মি তো কিনতে যায় না, কেবল জিনিসপত্র উলটে পালটে দেখে বেড়ায়, ঘেঁটে বেড়ায়, দর করে। শশাঙ্ক যদি কিনে দিতে চায় তার টাকার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে হাজতে রাখে।

শশাঙ্কর কাজের দরদ ঊর্মি একটুও বোঝে না। কখনো কখনো অত্যন্ত বাধা দেওয়ায় শশাঙ্কর কাছে তিরস্কার পেয়েছে। তার ফল এমন শোকাবহ হয়েছিল যে তার শোচনীয়তা অপসারণ করবার জন্যে শশাঙ্ককে দ্বিগুণ সময় দিতে হয়েছে। একদিকে ঊর্মির চোখে বাষ্পসঞ্চার অন্যদিকে অপরিহার্য কাজের তাড়া। তাই সংকটে প'ড়ে অবশেষে বাড়ির বাইরে চেম্বারেই ওর সমস্ত কাজকর্ম সেরে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু অপরাহ্ণ পেরলেই সেখানে থাকা দুঃসহ হয়ে ওঠে। কোনো কারণে যেদিন বিশেষ দেরি করে সেদিন ঊর্মির

অভিমান দুর্ভেদ্য মৌনের অন্তরালে দুরভিভব হয়ে ওঠে। এই রুদ্ধ অশ্রুতে কুহেলিকাচ্ছন্ন অভিমানটা ভিতরে ভিতরে শশাঙ্ককে আনন্দ দেয়। ভালো মানুষটির মতো বলে, "ঊর্মি, কথা কইবে না এ সত্যাগ্রহ রক্ষা করাই উচিত কিন্তু দোহাই ধর্ম, খেলবে না এমন পণ তো ছিল না।" তারপরে টেনিস-ব্যাট হাতে ক'রে চলে আসে। খেলায় শশাঙ্ক জিতের কাছাকাছি এসে ইচ্ছে ক'রেই হারে। নষ্ট সময়ের জন্যে আবার পরের দিন সকালে উঠেই অনুতাপ করতে থাকে।

কোনো একটা ছুটির দিনে বিকেলবেলায় শশাঙ্ক যখন ডানহাতে লাল-নীল পেনসিল নিয়ে বাঁ আঙুল-গুলো দিয়ে অকারণে চুল উসকোখুসকো করতে করতে আপিসের ডেস্কে ব'সে কোনো একটা দুঃসাধ্য কাজের উপর ঝুঁকে পড়েছে, ঊর্মি এসে বলে, "তোমার সেই দালালের সঙ্গে ঠিক করেছি আজ আমাকে পরেশনাথের মন্দির দেখাতে নিয়ে যাবে। চলো আমার সঙ্গে।

শশাঙ্ক মিনতি ক'রে বলে, "না ভাই, আজ না, এখন আমার ওঠবার জো নেই।"

কাজের গুরুত্বে ঊর্মি একটুও ভয় পায় না। বলে,

"অবলা রমণীকে অরক্ষিত অবস্থায় সবুজ পাগড়িধারীর হাতে সমর্পণ ক'রে দিতে সংকোচ নেই এই বুঝি তোমার শিভলরি।"

শেষকালে ওর টানাটানিতে শশাঙ্ক কাজ ফেলে যায় মোটর হাঁকিয়ে। এইরকম উৎপাত চলছে টের পেলে শর্মিলা বিষম বিরক্ত হয়। কেননা ওর মতে পুরুষের সাধনার ক্ষেত্রে মেয়েদের অনধিকার প্রবেশ কোনোমতেই মার্জনীয় নয়। উর্মিকে শর্মিলা বরাবর ছেলেমানুষ ব'লেই জেনেছে। আজো সেই ধারণাটা ওর মনে আছে। তা হোক, তাই ব'লে আপিসঘর তো ছেলেখেলার জায়গা নয়। তাই উর্মিকে ডেকে যথেষ্ট কঠিনভাবেই তিরস্কার করে। সে তিরস্কারের নিশ্চিত ফল হোতে পারত, কিন্তু স্ত্রীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে শশাঙ্ক স্বয়ং দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে উর্মিকে আশ্বাস দিয়ে চোখ টিপতে থাকে। তাসের প্যাক দেখিয়ে ইশারা করে, ভাবখানা এই যে, "চলে এসো, আপিসঘরে বসে তোমাকে পোকার খেলা শেখাব।" এখন খেলার সময় একেবারেই নয়, এবং খেলবার কথা মনে আনবারও সময় ও অভিপ্রায় ওর ছিল না। কিন্তু দিদির কঠোর ভর্ৎসনায় উর্মির মনে বেদনা লাগছে

এটা তাকে যেন উর্মির চেয়েও বেশি বাজে। ও নিজেই তাকে অনুনয়, এমন কি ঈষৎ তিরস্কার ক'রে কাজের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখতে পারত কিন্তু শর্মিলা যে এই নিয়ে উর্মিকে শাসন করবে এইটে সহ্য করা ওর পক্ষে বড়ো কঠিন।

শর্মিলা শশাঙ্ককে ডেকে বলে, "তুমি ওর সব আবদার এমন ক'রে শুনলে চলবে কেন। সময় নেই, অসময় নেই, তোমার কাজের লোকসান হয় যে।"

শশাঙ্ক বলে, "আহা ছেলেমানুষ, এখানে ওর সঙ্গী নেই কেউ, একটু খেলাধুলো না পেলে বাঁচবে কেন।"

এই তো গেল নানাপ্রকার ছেলেমানুষি। ওদিকে শশাঙ্ক যখন বাড়ি তৈরির প্ল্যান নিয়ে পড়ে, ও তার পাশে চৌকি টেনে নিয়ে এসে বলে, বুঝিয়ে দাও। সহজেই বোঝে, গাণিতিক নিয়মগুলো জটিল ঠেকে না। শশাঙ্ক ভারি খুশি হয়ে উঠে ওকে প্রব্লেম দেয়, ও কষে নিয়ে আসে। জুট্ কোম্পানীর স্টীমলঞ্চে শশাঙ্ক কাজ তদন্ত করতে যায়, ও ধ'রে বসে, আমিও যাব। শুধু যায় তা নয়, মাপজোখের হিসাব নিয়ে তর্ক করে, শশাঙ্ক পুলকিত হয়ে ওঠে। ভরপুর কবিত্বের চেয়ে এর রস বেশি। এখন তাই চেম্বারের কাজ যখন বাড়িতে নিয়ে

আসে তা নিয়ে ওর মনে আশঙ্কা থাকে না। লাইন টানা আঁক কষার কাজে তার সঙ্গী জুটেছে। ঊর্মিকে পাশে নিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কাজ এগোয়। খুব দ্রুত-বেগে এগোয় না বটে, কিন্তু সময়ের দীর্ঘতাকে সার্থক মনে হয়।

এইখানটাতে শর্মিলাকে রীতিমতো ধাক্কা দেয়। ঊর্মির ছেলেমানুষিও সে বোঝে, তার গৃহিণীপনার ত্রুটিও সস্নেহে সহ্য করে, কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীবুদ্ধির দূরত্বকে স্বয়ং অনিবার্য ব'লে মেনে নিয়েছিল সেখানে ঊর্মির অবাধে গতিবিধি ওর একটুও ভালো লাগে না। ওটা নিতান্তই স্পর্ধা। আপন আপন সীমা মেনে চলাকেই গীতা বলেন স্বধর্ম।

মনে মনে অত্যন্ত অধীর হয়েই একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ঊর্মি, তোর কি ঐসব আঁকাজোখা আঁক কষা ট্রেস করা সত্যই ভালো লাগে।"

"আমার ভারি ভালো লাগে দিদি।"

শর্মিলা অবিশ্বাসের সুরে বললে, "হাঁঃ, ভালো লাগে। ওকে খুশি করবার জন্যেই দেখাস যেন ভালো লাগে।"

না হয় তাই হোলো। খাওয়ানোপরানো সেবাযত্নে

শশাঙ্ককে খুশি করাটা তো শর্মিলার মনঃপূত। কিন্তু এই জাতের খুশিটা ওর নিজের খুশির জাতের সঙ্গে মেলে না।

শশাঙ্ককে বারবার ডেকে বলে, “ওকে নিয়ে সময় নষ্ট করো কেন। ওতে যে তোমার কাজের ক্ষতি হয়। ও ছেলেমানুষ, এসব কী বুঝবে।”

শশাঙ্ক বলে, “আমার চেয়ে কম বোঝে না।”

মনে করে এই প্রশংসায় দিদিকে বুঝি আনন্দ দেওয়াই হোলো। নির্বোধ।

নিজের কাজের গৌরবে শশাঙ্ক যখন আপন স্ত্রীর প্রতি মনোযোগকে খাটো করেছিল, তখন শর্মিলা সেটা যে শুধু অগত্যা মেনে নিয়েছিল তা নয়, তাতে সে গর্ব বোধ করত। তাই ইদানীং আপন সেবাপরায়ণ হৃদয়ের দাবি অনেক পরিমাণেই কমিয়ে এনেছে। ও বলত, পুরুষমানুষ রাজার জাত, দুঃসাধ্য কর্মের অধিকার ওদের নিয়তই প্রশস্ত করতে হবে। নইলে তারা মেয়েদের চেয়েও নীচু হয়ে যায়। কেননা মেয়েরা আপন স্বাভাবিক মাধুর্যে ভালোবাসার জন্মগত ঐশ্বর্যেই সংসারে প্রতিদিন আপন আসনকে সহজেই সার্থক করে। কিন্তু পুরুষের নিজেকে সার্থক করতে হয় প্রত্যহ

যুদ্ধের দ্বারা। সেকালে রাজারা বিনা প্রয়োজনেই রাজ্যবিস্তার করতে বেরোত। রাজ্যলোভের জন্যে নয়, নূতন ক'রে পৌরুষের গৌরব প্রমাণের জন্যে। এই গৌরবে মেয়েরা যেন বাধা না দেয়। শর্মিলা বাধা দেয়নি, ইচ্ছা ক'রেই শশাঙ্ককে তার লক্ষ্যসাধনায় সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়েছে। একসময়ে তাকে ওর সেবাজালে জড়িয়ে ফেলেছিল, মনে দুঃখ পেলেও সেই জালকে ক্রমশ খর্ব করে এনেছে। এখনো সেবা যথেষ্ট করে অদৃশ্যে নেপথ্যে।

হায় রে, আজ ওর স্বামীর এ কী পরাভব দিনে দিনে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। রোগশয্যা থেকে সব ও দেখতে পায় না, কিন্তু যথেষ্ট আভাস পায়। শশাঙ্কের মুখ দেখলেই বুঝতে পারে সে যেন সর্বদাই কেমন আবিষ্ট হয়ে আছে। ঐ একরত্তি মেয়েটা এসে অল্প এই কদিনেই এতবড়ো সাধনার আসন থেকে ঐ কর্মকঠিন পুরুষকে বিচলিত করে দিলে। আজ স্বামীর এই অশ্রদ্ধেয়তা শর্মিলাকে রোগের বেদনার চেয়েও বেশি করে বাজছে।

শশাঙ্কের আহারবিহার বেশবাসের চিরাচরিত ব্যবস্থায় নানারকম ত্রুটি হচ্ছে সন্দেহ নেই। যে পথ্যটা তার

বিশেষ রুচিকর, সেটাই খাবার সময় হঠাৎ দেখা যায় অবর্তমান। তার কৈফিয়ত মেলে, কিন্তু কোনো কৈফিয়তকে এ সংসার এতদিন আমল দেয়নি। এসব অনবধানতা ছিল অমার্জনীয়, কঠোর শাসনের যোগ্য; সেই বিধিবদ্ধ সংসারে আজ এতবড়ো যুগান্তর ঘটেছে যে গুরুতর ত্রুটিগুলোও প্রহসনের মতো হয়ে উঠল। দোষ দেব কা'কে। দিদির নির্দেশমতো ঊর্মি যখন রান্নাঘরে বেতের মোড়ার উপর ব'সে পাকপ্রণালীর পরিচালনকার্যে নিযুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে পাচক ঠাকরুনের পূর্বজীবনের বিবরণগুলির পর্যালোচনাও চলছে, এমন সময় শশাঙ্ক হঠাৎ এসে বলে, "ওসব এখন থাক্।"

"কেন কী করতে হবে।"

"আমার এবেলা ছুটি আছে, চলো, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিল্‌ডিংটা দেখবে। ওটার গুমর দেখলে হাসি পায় কেন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।"

এতবড়ো প্রলোভনে কর্তব্যে ফাঁকি দিতে ঊর্মির মনও তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। শর্মিলা জানে পাকশালা থেকে তার সহোদরার অন্তর্ধানে আহার্যের উৎকর্ষসাধনে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না, তবু স্নিগ্ধ

হৃদয়ের যত্নটুকু শশাঙ্কের আরামকে অলংকৃত করে। কিন্তু আরামের কথা তুলে কী হবে, যখন প্রতিদিনই স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আরামটা সামান্য হয়ে গেছে, স্বামী হয়েছে খুশি।

এইদিক থেকে শর্মিলার মনে এল অশান্তি। রোগশয্যায় এপাশ-ওপাশ ফিরতে ফিরতে নিজেকে বার বার ক'রে বলছে, "মরবার আগে ঐ কথাটুকু বুঝে গেলুম ; আর সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারিনি। ভেবেছিলুম উর্মিমালার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তু ও তো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর এক মেয়ে।" জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, "আমার জায়গা ও নেয়নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।"

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শীতের দিন আসছে, গরম কাপড়গুলো রোদ্দুরে দেওয়া চাই। উর্মি তখন শশাঙ্কর সঙ্গে পিং পং খেলছিল, ডেকে পাঠালে।

বললে, "উর্মি, এই নে চাবি। গরম কাপড়গুলো ছাদের উপর রোদে মেলে দে গে।"

উর্মি আলমারিতে চাবি সবেমাত্র লাগিয়েছে এমন

সময় শশাঙ্ক এসে বললে, "ওসব পরে হবে, ঢের সময় আছে। খেলাটা শেষ করে যাও।"

"কিন্তু দিদি—

"আচ্ছা, দিদির কাছে ছুটি নিয়ে আসছি।"

দিদি ছুটি দিলে, সেই সঙ্গে বড়ো একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

দাসীকে ডেকে বললে, "দে তো আমার মাথায় ঠাণ্ডাজলের পটি।"

যদিও অনেকদিন পরে হঠাৎ ঊর্মি ছাড়া পেয়ে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, তবু সহসা এক-একদিন মনে পড়ত ওর জীবনের কঠিন দায়িত্ব। ও তো স্বাধীন নয়, ও যে বাঁধা ওর ব্রতের সঙ্গে। তারি সঙ্গে মিলিয়ে যে-বাঁধন ওকে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বেঁধেছে তার অনুশাসন আছে ওর 'পরে। ওর দৈনিক কর্তব্যের খুঁটিনাটি সেই তো স্থির করে দিয়েছে। ওর জীবনের 'পরে তার চিরকালের অধিকার এ-কথা ঊর্মি কোনো-মতে অস্বীকার করতে পারে না। যখন নীরদ উপস্থিত ছিল স্বীকার করা সহজ ছিল, জোর পেত মনে। এখন

ওর ইচ্ছে একেবারেই বিমুখ হয়ে গেছে অথচ কর্তব্যবুদ্ধি তাড়া দিচ্ছে। কর্তব্যবুদ্ধির অত্যাচারেই মন আরো যাচ্ছে বিগড়িয়ে। নিজের অপরাধ ক্ষমা করা কঠিন হয়ে উঠল ব'লেই অপরাধ প্রশ্রয় পেতে লাগল। বেদনায় আফিমের প্রলেপ দেবার জন্যে শশাঙ্কের সঙ্গে খেলায় আমোদে নিজেকে সর্বক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বলে, যখন সময় আসবে তখন আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে, এখন যে-কয়দিন ছুটি ওসব কথা থাক্। আবার হঠাৎ এক-একদিন মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বই খাতা ট্রাঙ্কের থেকে বের করে তার উপরে মাথা গুঁজে বসে। তখন শশাঙ্কর পালা। বইগুলো টেনে নিয়ে পুনরায় বাক্সজাত ক'রে সেই বাক্সর উপর সে চেপে বসে। উর্মি বলে, "শশাঙ্কদা, ভারি অন্যায়। আমার সময় নষ্ট কোরো না।"

শশাঙ্ক বলে, "তোমার সময় নষ্ট করতে গেলে আমারো সময় নষ্ট। অতএব শোধবোধ।"

তারপরে খানিকক্ষণ কাড়াকাড়ির চেষ্টা ক'রে অবশেষে উর্মি হার মানে। সেটা যে ওর পক্ষে নিতান্ত আপত্তিজনক তা মনে হয় না। এইরকম বাধা পেলেও কর্তব্যবুদ্ধির পীড়ন দিনপাঁচ-ছয় একাদিক্রমে চলে, তারপরে আবার তার জোর কমে যায়। বলে,

"শশাঙ্কদা, আমাকে দুর্বল মনে কোরো না। মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেই রেখেছি।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ এখানে ডিগ্রি নিয়ে য়ুরোপে যাব ডাক্তারি শিখতে।"

"তার পরে?"

"তার পরে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ক'রে তার ভার নেব।"

"আর কার ভার নেবে। ঐ যে নীরদ মুখুজ্জে ব'লে একটা ইনসাফারেবল্‌"—

শশাঙ্কের মুখ চাপা দিয়ে উর্মি বলে "চুপ করো। এই সব কথা বলো যদি তোমার সঙ্গে একেবারে ঝগড়া হয়ে যাবে।"

নিজেকে উর্মি খুব কঠিন ক'রে বলে, সত্য হোতে হবে আমাকে সত্য হোতে হবে। নীরদের সঙ্গে ওর যে-সম্বন্ধ বাবা স্বয়ং স্থির করে দিয়েছেন তার প্রতি খাঁটি না হোতে পারাকে ও অসতীত্ব ব'লে মনে করে।

কিন্তু মুশকিল এই যে, অপর পক্ষ থেকে কোনো জোর পায় না। উর্মি যেন এমন একটি গাছ যা মাটিকে আঁকড়ে আছে কিন্তু আকাশের আলো থেকে বঞ্চিত।

পাতাগুলো পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে। এক-একসময় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, মনে মনে ভাবে, এ মানুষটা চিঠির মতো চিঠি লিখতে পারে না কেন।

উর্মি অনেক কাল কনভেণ্টে পড়েছে। আর কিছু না হোক ইংরেজিতে ওর বিদ্যে পাকা। সে-কথা নীরদের জানা ছিল। সেইজন্যেই ইংরেজি লিখে নীরদ ওকে অভিভূত করবে এই ছিল তার পণ। বাংলায় চিঠি লিখলে বিপদ বাঁচত কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বেচারা জানে না যে, সে ইংরেজি জানে না। ভারি ভারি শব্দ জুটিয়ে এনে, পুঁথিগত দীর্ঘপ্রস্থ বচন যোজনা ক'রে ওর বাক্যগুলোকে করে তুলত বস্তাবোঝাই গোরুর গাড়ির মতো। উর্মির হাসি আসত, কিন্তু হাসতে সে লজ্জা পেত, নিজেকে তিরস্কার ক'রে বলত বাঙালীর ইংরেজিতে ত্রুটি হোলে তা নিয়ে দোষ ধরা স্নবিশ্‌।

দেশে থাকতে মোকাবিলায় যখন নীরদ ক্ষণে ক্ষণে সদুপদেশ দিয়েছে তখন ওর রকম-সকমে সেগুলো গভীর হয়ে উঠেছে গৌরবে। যতটা কানে শোনা যেত তার চেয়ে আন্দাজে তার ওজন হোত বেশি।

লম্বা চিঠিতে আন্দাজের জায়গা থাকে না।

কোমর-বাঁধা ভারি ভারি কথা হালকা হয়ে যায়, মোটা মোটা আওয়াজেই ধরা পড়ে বলবার বিষয়ের কমতি।

নীরদের যে ভাবটা কাছে থাকতে ও সয়ে গিয়েছিল সেইটে দূরের থেকে ওকে সবচেয়ে বাজে। লোকটা একেবারেই হাসতে জানে না। চিঠিতে সবচেয়ে প্রকাশ পায় সেই অভাবটা। এই নিয়ে শশাঙ্কের সঙ্গে তুলনা ওর মনে আপনিই এসে পড়ে।

তুলনার একটা উপলক্ষ্য এই সেদিন হঠাৎ ঘটেছে। কাপড় খুঁজতে গিয়ে বাক্সের তলা থেকে বেরোল পশমে-বোনা একপাটি অসমাপ্ত জুতো। মনে পড়ে গেল চার বছর আগেকার কথা। তখন হেমন্ত ছিল বেঁচে। ওরা সকলে মিলে গিয়েছিল দার্জিলিঙে। আমোদের অন্ত ছিল না। হেমন্তে আর শশাঙ্কে মিলে ঠাট্টাতামাশার পাগলা-ঝোরা বইয়ে দিয়েছিল। ঊর্মি তার এক মাসির কাছ থেকে পশমের কাজ নতুন শিখেছে। জন্মদিনে দাদাকে দেবে ব'লে একজোড়া জুতো বুনছিল। তা নিয়ে শশাঙ্ক ওকে কেবলই ঠাট্টা করত, বলত, "দাদাকে আর যাই দাও, জুতো নয়, ভগবান মনু বলেছেন ওতে গুরুজনের

অসম্মান হয়।" ঊর্মি কটাক্ষ ক'রে বলেছিল, "ভগবান মনু তবে কাকে প্রয়োগ করতে বলেন।"

শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে বললে, "অসম্মানের সনাতন অধিকার ভগ্নীপতির। আমার পাওনা আছে। সেটা সুদে ভারি হয়ে উঠল।"

"মনে তো পড়ছে না।"

"পড়বার কথা নয়। তখন ছিলে নিতান্ত নাবালিকা। সেই কারণেই তোমার দিদির সঙ্গে শুভলগ্নে যেদিন এই সৌভাগ্যবানের বিবাহ হয়, সেদিন বাসর-রজনীর কর্ণধারপদ গ্রহণ করতে পারোনি। আজ সেই কোমল করপল্লবের অরচিত কানমলাটাই রূপ গ্রহণ করছে সেই করপল্লবরচিত জুতোযুগলে। ওটার প্রতি আমার দাবি রইল জানিয়ে রেখে দিলুম।"

দাবি শোধ হয়নি, সে-জুতো যথাসময়ে প্রণামীরূপে নিবেদিত হয়েছিল দাদার চরণে। তারপর কিছুকাল পরে শশাঙ্কর কাছ থেকে ঊর্মি একখানি চিঠি পেল। পেয়ে খুব হেসেছে সে। সেই চিঠি আজও তার বাক্সে আছে। আজ খুলে সে আবার পড়লে :

"কাল তো তুমি চলে গেলে। তোমার স্মৃতি পুরাতন হোতে না হোতে তোমার নামে একটা কলঙ্ক

ঘটনা হয়েছে সেটা তোমার কাছে গোপন করা অকর্তব্য মনে করি।

আমার পায়ে একজোড়া তালতলীয় চটি অনেকেই লক্ষ্য করেছে। কিন্তু তার চেয়ে লক্ষ্য করেছে তার ছিদ্রভেদ ক'রে আমার চরণনখরপংক্তি মেঘমুক্ত চন্দ্রমালার মতো। (ভারত-চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল দ্রষ্টব্য। উপমার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ ঘটলে তোমার দিদির কাছে মীমাংসনীয়।) আজ সকালে আমার আপিসের বৃন্দাবন নন্দী যখন আমার সপাদুক চরণ স্পর্শ ক'রে প্রণাম করলে তখন আমার পদমর্যাদায় যে বিদীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে তারি অগৌরব মনে আন্দোলিত হোলো। সেবককে জিজ্ঞাসা করলেম, "মহেশ, আমার সেই অন্য নূতন চটি জোড়াটা গতিলাভ করেছে অন্য কোন্ অনধিকারীর শ্রীচরণে।" সে মাথা চুলকিয়ে বললে, "এ-বাড়ির ঊর্মি মাসিদের সঙ্গে আপনিও যখন দার্জিলিঙ যান সেই সময়ে চটিজোড়াটাও গিয়েছিল। আপনি ফিরে এসেছেন সেই সঙ্গে ফিরে এসেছে তার একপাটি, আর এক পাটি—" তার মুখ লাল হয়ে উঠল। আমি এক ধমক দিয়ে বললুম, "বাস, চুপ।" সেখানে অনেক লোক ছিল। চটিজুতো-হরণ হীনকায। কিন্তু মানুষের মন দুর্বল, লোভ দুর্দম, এমন কাজ করে ফেলে, ঈশ্বর বোধ করি ক্ষমা করেন। তবু অপহরণ-কাজে বুদ্ধির পরিচয় থাকলে দুষ্কার্যের গ্লানি অনেকটা কাটে। কিন্তু একপাটি চটি !!! ধিক !!!

যে এ-কাজ করেছে, যথাসাধ্য তার নাম আমি উহ্য রেখেছি। সে যদি তার স্বভাবসিদ্ধ মুখরতার সঙ্গে এই নিয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করে তাহলে কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে যাবে। চটি নিয়ে চটাচটি সেইখানেই খাটে যেখানে মন খাঁটি। মহেশের মতো নিন্দুকের মুখবন্ধ এখনি করতে পারো একজোড়া শিল্পকাযখচিত চটির সাহায্যে। যেমন তার আস্পর্ধা। পায়ের মাপ এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি।"

চিঠিখানা পেয়ে উর্মি স্মিতমুখে পশমের জুতো বুনতে বসেছিল কিন্তু শেষ করেনি। পশমের কাজে আর তার উৎসাহ ছিল না। আজ এটা আবিষ্কার ক'রে স্থির করলে এই অসমাপ্ত জুতোটাই দেবে শশাঙ্ককে সেই দার্জিলিঙ-যাত্রার সাম্বৎসরিক দিনে। সে-দিন আর কয়েক সপ্তাহ পরেই আসছে। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল— হায় রে কোথায় সেই হাস্যোজ্জ্বল আকাশে হালকাপাখায় উড়ে-যাওয়া দিনগুলি! এখন থেকে সামনে প্রসারিত নিরবকাশ কর্তব্যকঠোর মরুজীবন।

আজ ২৬শে ফাল্গুন। হোলিখেলার দিন। মফস্বলের কাজে এ-খেলায় শশাঙ্কের সময় ছিল না, এ-দিনের কথা তারা ভুলেই গেছে। উর্মি আজ তার শয্যাগত দিদির পায়ে আবিরের টিপ দিয়ে প্রণাম করেছে। তারপরে

খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলে শশাঙ্ক আপিসঘরের ডেস্কে ঝুঁকে প'ড়ে একমনে কাজ করছে। পিছন থেকে গিয়ে দিলে তার মাথায় আবির মাখিয়ে, রাঙিয়ে উঠল তার কাগজপত্র। মাতামাতির পালা পড়ে গেল। ডেস্কে ছিল দোয়াতে লাল কালি, শশাঙ্ক দিলে ঊর্মির শাড়িতে ঢেলে। হাত চেপে ধ'রে তার আঁচল থেকে ফাগ কেড়ে নিয়ে ঊর্মি'র মুখে দিলে ঘ'ষে, তারপরে দৌড়াদৌড়ি ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি। বেলা যায় চলে, স্নানাহারের সময় যায় পিছিয়ে, ঊর্মি'র উচ্চহাসির স্বরোচ্ছ্বাসে সমস্ত বাড়ি মুখরিত। শেষকালে শশাঙ্কের অস্বাস্থ্য আশঙ্কায় দূতের পরে দূত পাঠিয়ে শর্মিলা এদের নিবৃত্ত করলে।

দিন গেছে। রাত্রি হয়েছে অনেক। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখাজাল ছাড়িয়ে পূর্ণচাঁদ উঠেছে অনাবৃত আকাশে। হঠাৎ ফাল্গুনের দমকা হাওয়ায় ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে দোলাদুলি ক'রে উঠেছে বাগানের সমস্ত গাছপালা, তলাকার ছায়ার জাল তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জানলার কাছে ঊর্মি চুপ ক'র ব'সে। ঘুম আসছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয়নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে। আজ বসন্তে

মাধবীলতার মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা সেই বেদনা যেন ঊর্মি'র সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেছে। পাশের নাবার ঘরে গিয়ে মাথা ধুয়ে নিলে, গা মুছলে ভিজে তোয়ালে দিয়ে। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে কিছুক্ষণ পরে স্বপ্ন-জড়িত ঘুমে আবিষ্ট হয়ে পড়ল।

রাত্রি তিনটের সময় ঘুম ভেঙেছে। চাঁদ তখন জানলার সামনে নেই। ঘরে অন্ধকার, বাইরে আলোয় ছায়ায় জড়িত সুপারিগাছের বীথিকা। ঊর্মি'র বুক ফেটে কান্না এল, কিছুতে থামতে চায় না। উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। প্রাণের এই কান্না, ভাষায় এর শব্দ নেই, অর্থ নেই। প্রশ্ন করলে ও কি বলতে পারে কোথা থেকে এই বেদনার জোয়ার উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে ওর দেহে মনে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের কর্মতালিকা, রাত্রের সুখনিদ্রা।

সকালে ঊর্মি যখন ঘুম ভেঙে উঠল তখন ঘরের মধ্যে রৌদ্র এসে পড়েছে। সকালবেলাকার কাজে ফাঁক পড়ল, ক্লান্তির কথা মনে ক'রে শর্মিলা ওকে ক্ষমা করেছে। কিসের অনুতাপে ঊর্মি আজ অবসন্ন। কেন

মনে হচ্ছে ওর হার হোতে চলল। দিদিকে গিয়ে বললে, “দিদি, আমি তো তোমার কোনো কাজ করতেই পারিনে—বলো তো বাড়ি ফিরে যাই।”

আজ তো শর্মিলা বলতে পারলে না, “না যাসনে।” বললে, “আচ্ছা যা তুই। তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে। যখন মাঝে মাঝে সময় পাবি দেখে শুনে যাস।”

শশাঙ্ক তখন কাজে বেরিয়ে গেছে। সেই অবকাশে সেইদিনই ঊর্মি বাড়ি চলে গেল।

শশাঙ্ক সে-দিন যান্ত্রিক ছবি আঁকার এক সেট সরঞ্জাম কিনে বাড়ি ফিরলে। ঊর্মিকে দেবে, কথা ছিল তাকে এই বিদ্যেটা শেখাবে। ফিরে এসে তাকে যথাস্থানে না দেখতে পেয়ে শর্মিলার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, “ঊর্মি গেল কোথায়।”

শর্মিলা বললে, “এখানে তার পড়াশুনোর অসুবিধে হচ্ছে ব'লে সে বাড়ি চলে গেছে।”

“কিছুদিন অসুবিধে করবে ব'লে সে তো প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। অসুবিধের কথা হঠাৎ আজই মনে উঠল কেন।”

কথার সুর শুনে শর্মিলা বুঝলে শশাঙ্ক তাকেই সন্দেহ করছে। সে-সম্বন্ধে কোনো বৃথা তর্ক না করে



বললে, "আমার নাম ক'রে তুমি তাকে ডেকে নিয়ে এসো, নিশ্চয় কোনো আপত্তি করবে না।"

ঊর্মি বাড়িতে ফিরে এসে দেখলে অনেকদিন পরে বিলেত থেকে ওর নামে নীরদের চিঠি এসে অপেক্ষা করছে। ভয়ে খুলতেই পারছিল না। মনে জানে নিজের তরফে অপরাধ জমা হয়ে উঠেছে। নিয়মভঙ্গের কৈফিয়ত স্বরূপ এর আগে দিদির রোগের উল্লেখ করেছিল। কিছুদিন থেকে কৈফিয়তটা প্রায় এসেছে মিথ্যে হয়ে। শশাঙ্ক বিশেষ জেদ ক'রে শর্মিলার জন্যে দিনে একজন রাত্রে একজন নার্স নিযুক্ত করে দিয়েছে। ডাক্তারের বিধানমতে রোগীর ঘরে সর্বদা আত্মীয়দের আনাগোনা তারা রোধ করে। ঊর্মি মনে জানে নীরদ দিদির রোগের কৈফিয়তটাকেও গুরুতর মনে করবে না, বলবে, "ওটা কোনো কাজের কথা নয়।" বস্তুতই কাজের কথা নয়। আমাকে তো দরকার হচ্ছে না। অনুতপ্তচিত্তে স্থির করলে এবারে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইব। বলব আর কখনো ত্রুটি হবে না, কিছুতে নিয়মভঙ্গ করব না।

চিঠি খোলবার আগে অনেকদিন পরে আবার বের করলে সেই ফোটোগ্রাফখানা। টেবিলের উপর রেখে

দিলে। জানে ঐ ছবিটা দেখলে শশাঙ্ক খুব বিদ্রূপ করবে। তবু ঊর্মি কিছুতেই কুণ্ঠিত হবে না তার বিদ্রূপে; এই তার প্রায়শ্চিত্ত। নীরদের সঙ্গে ওর বিবাহ হবে এই প্রসঙ্গটা দিদিদের বাড়িতে ও চাপা দিত। অন্যেরাও তুলত না কেননা এ প্রসঙ্গটা ওখানকার সকলের অপ্রিয়। আজ হাত মুঠো ক'রে ঊর্মি স্থির করলে—ওর সকল ব্যবহারেই এই সংবাদটা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করবে। কিছুদিন থেকে লুকিয়ে রেখেছিল এনগেজমেণ্ট আঙটি। সেটা বের ক'রে পরলে। আঙটিটা নিতান্তই কম দামের,—নীরদ আপন অনেস্ট গরিবিয়ানার গর্বের দ্বারাই ঐ সস্তা আঙটির দাম হীরের চেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভাবখানা এই যে, "আঙটির দামেই আমার দাম নয় আমার দামেই আঙটির দাম।"

নিজেকে যথাসাধ্য শোধন করে নিয়ে ঊর্মি অতি ধীরে লেফাফাটা খুললে।

চিঠিখানা প'ড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ইচ্ছা করল নাচতে, কিন্তু নাচ ওর অভ্যেস নেই। সেতারটা ছিল বিছানার উপর, সেটা তুলে নিয়ে সুর না বেঁধেই ঝনাঝন ঝংকার দিয়ে যা-তা বাজাতে লাগল।

ঠিক এমন সময়ে শশাঙ্ক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, “ব্যাপারখানা কী। বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল বুঝি ?”

“হাঁ শশাঙ্কদা, স্থির হয়ে গেছে।”

“কিছুতেই নড়চড় হবে না ?”

“কিছুতেই না।”

“তাহলে এইবেলা সানাই বায়না দিই, আর ভীমনাগের সন্দেশ ?”

“তোমাকে কোনো চেষ্টা করতে হবে না।”

“নিজেই সব করবে ? ধন্য বীরাঙ্গনা। আর কনেকে আশীর্বাদ ?”

“সে-আশীর্বাদের টাকাটা আমার নিজের পকেট থেকেই গেছে।”

“মাছের তেলেই মাছভাজা ? ভালো বোঝা গেল না।”

“এই নাও বুঝে দেখো।”

ব'লে চিঠিখানা ওর হাতে দিলে।

প'ড়ে শশাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল।

লিখছে, যে-রিসার্চের দুরূহ কাজে নীরদ আত্ম-নিবেদন করতে চায়, ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয়। সেই-জন্যেই ওর জীবনে আর একটা মস্ত স্যাক্রিফাইস মেনে

নিতে হোলো। ঊর্মির সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলে উপায় নেই। একজন য়ুরোপীয় মহিলা ওকে বিবাহ ক'রে ওর কাজে আত্মদান করতে সম্মত। কিন্তু কাজটা সেই একই, ভারতবর্ষেই করা হোক আর এখানেই। রাজারামবাবু যে-কাজের জন্য অর্থ দিতে চেয়েছিলেন, তার কিয়দংশ সেখানে নিযুক্ত করলে অন্যায় হবে না। তাতে মৃতব্যক্তির 'পরে সম্মান করাই হবে।

শশাঙ্ক বললে, "জীবিত ব্যক্তিটাকে কিছু কিছু দিয়ে যদি সেই দূরদেশেই দীর্ঘকাল জিইয়ে রাখতে পারো তো মন্দ হয় না। টাকা বন্ধ করলে পাছে খিদের জ্বালায় মরিয়া হয়ে এখানে দৌড়ে আসে এই ভয় আছে।"

ঊর্মি হেসে বললে, "সে-ভয় যদি তোমার মনে থাকে, টাকা তুমিই দিয়ো, আমি এক পয়সাও দেব না।"

শশাঙ্ক বললে, "আবার তো মন বদল হবে না। মানিনীর অভিমান তো অটল থাকবে।"

"বদল হোলে তোমার তাতে কী শশাঙ্কদা।"

"প্রশ্নের সত্য উত্তর দিলে অহংকার বেড়ে যাবে, অতএব তোমার হিতের জন্যে চুপ করে রইলুম। কিন্তু

ভাবছি, লোকটার গণ্ডদেশ তো কম নয়, ইংরেজিতে যাকে বলে চীক্।”

ঊর্মির মনের মধ্যে থেকে প্রকাণ্ড একটা ভার নেমে গেল—বহুদিনের ভার। মুক্তির আনন্দে ও কী যে করবে তা ভেবে পাচ্ছে না। ওর সেই কাজের ফর্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। গলিতে ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছিল, জানালা থেকে আঙটিটা ছুঁড়ে ফেললে তার দিকে।

জিজ্ঞাসা করলে, “এই পেনসিলের দাগ দেওয়া মোটা বইগুলো কি কোনো হকার কিনবে।”

“নাই যদি কেনে, তার ফলাফলটা কী আগে শুনি।”

“যদি ওর মধ্যে সাবেককালের ভূতটা বাসা করে। মাঝে মাঝে অর্ধেক রাত্রে তর্জনী তুলে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়।”

“সে আশঙ্কা যদি থাকে হকারের অপেক্ষা করব না, আমি নিজেই কিনব।”

“কিনে কী করবে।”

“হিন্দুশাস্ত্রমতে অন্ত্যেষ্টিসৎকার। গয়া পর্যন্ত যেতে রাজি, তাতে যদি তোমার মন সান্ত্বনা পায়।”

"না, অতটা বাড়াবাড়ি সইবে না।"

"আচ্ছা, আমার লাইব্রেরির কোণে পিরামিড বানিয়ে ওদের মামি করে রেখে দেব।"

"আজ কিন্তু তুমি কাজে বেরোতে পাবে না।"

"সমস্ত দিন ?"

"সমস্ত দিনই।"

"কী করতে হবে।"

"মোটরে ক'রে উধাও হয়ে যাব।"

"দিদির কাছে ছুটি নিয়ে এসো গে।"

"না, ফিরে এসে দিদিকে বলব, তখন খুব বকুনি খাব। সে-বকুনি সইবে।"

"আচ্ছা, আমিও তোমার দিদির বকুনি হজম করতে রাজি, টায়ার যদি ফাটে দুঃখিত হব না, ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে দুটো-চারটে মানুষ চাপা দিয়ে একেবারে জেলখানা পর্যন্ত পৌঁছতে আপত্তি নেই কিন্তু তিন সত্যি দাও যে মোটর-রথযাত্রা সাঙ্গ ক'রে আমাদেরি বাড়িতে তুমি ফিরে আসবে।"

"আসব, আসব, আসব।"

মোটরযাত্রার শেষে ভবানীপুরের বাড়িতে দুজনে এল, কিন্তু ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের বেগ রক্ত থেকে এখনো

কিছুতেই থামতে চায় না। সংসারের সমস্ত দাবি সমস্ত ভয় লজ্জা এই বেগের কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

কয়দিন শশাঙ্কের সব কাজ গেল ঘুলিয়ে। মনের ভিতরে ভিতরে সে বুঝেছে যে, এটা ভালো হচ্ছে না। কাজের ক্ষতি খুব গুরুতর হওয়াও অসম্ভব নয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুর্ভাবনায় দুঃসম্ভাবনাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে। কিন্তু পরের দিনে আবার সে স্বাধিকার-প্রমত্ত, মেঘদূতের যক্ষের মতন। মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়।

কিছুকাল এই রকম যায়। লাগল চোখে ঘোর, মন উঠল আবিল হয়ে।

নিজেকে সুস্পষ্ট বুঝতে ঊর্মির সময় লেগেছে, কিন্তু একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বুঝলে।

মথুরদাদাকে ঊর্মি কী জানি কেন ভয় করত, এড়িয়ে বেড়াত তাকে। সেদিন মথুর সকালে দিদির ঘরে এসে বেলা দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে গেল।

তারপরে দিদি ঊর্মিকে ডেকে পাঠালে। মুখ তার কঠোর অথচ শান্ত। বললে, "প্রতিদিন ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কী কাণ্ড করেছিস জানিস তা।"

ঊর্মি ভয় পেয়ে গেল। বললে, "কী হয়েছে দিদি।"

দিদি বললে, "মথুরদাদা জানিয়ে গেল, কিছুদিন ধরে তোর ভগ্নীপতি নিজে কাজ একেবারে দেখেননি। জহরলালের উপরে ভার দিয়েছিলেন সে মালমসলায় দুহাত চালিয়ে চুরি করেছে, বড়ো বড়ো গুদামঘরের ছাদ একেবারে ঝাঁজরা, সেদিনকার বৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, মাল যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। আমাদের কোম্পানির মস্ত নাম, তাই ওরা পরীক্ষা করেনি, এখন মস্ত অখ্যাতি

এবং লোকসানের দায় পড়েছে ঘাড়ে। মথুরদাদা স্বতন্ত্র হবেন।"

উর্মির বুক ধক্ করে উঠল, মুখ হয়ে গেল পাঁশের মতো। এক মুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় আপন মনের প্রচ্ছন্ন রহস্য প্রকাশ পেলে। স্পষ্ট বুঝলে, কখন অজ্ঞাতসারে তার মনের ভিতরটা উঠেছিল মাতাল হয়ে, —ভালোমন্দ কিছুই বিচার করতে পারেনি। শশাঙ্কর কাজটাই যেন ছিল তার প্রতিযোগী, তারি সঙ্গে ওর আড়াআড়ি। কাজের থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সর্বদা সম্পূর্ণ কাছে পাবার জন্যে উর্মি কেবল ভিতরে ভিতরে ছটফট করত। কতদিন এমন ঘটেছে, শশাঙ্ক যখন স্নানে, এমন সময় কাজের কথা নিয়ে লোক এসেছে; উর্মি কিছু না ভেবে ব'লে পাঠিয়েছে "বল্‌গে এখন দেখা হবে না।"

ভয়, পাছে স্নান ক'রে এসেই শশাঙ্ক আর অবকাশ না পায়, পাছে এমন ক'রে কাজে জড়িয়ে পড়ে যে, উর্মির দিনটা হয় ব্যর্থ। তার দুরন্ত নেশার সাংঘাতিক ছবিটা সম্পূর্ণ চোখে জেগে উঠল। তৎক্ষণাৎ দিদির পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। বারবার ক'রে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলতে লাগল, "তাড়িয়ে দাও তোমাদের

ঘর থেকে আমাকে। এখনি দূর করে তাড়িয়ে দাও।”

আজ দিদি নিশ্চিত স্থির করে বসেছিল কিছুতেই উর্মিকে ক্ষমা করবে না। মন গেল গলে।

আস্তে আস্তে উর্মিমালার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, “কিছু ভাবিসনে, যা হয় একটা উপায় হবে।”

উর্মি উঠে বসল। বললে, “দিদি তোমাদেরই বা কেন লোকসান হবে। আমারো তো টাকা আছে।”

শর্মিলা বললে, “পাগল হয়েছিস? আমার বুঝি কিছু নেই। মথুরদাদাকে বলেছি, এই নিয়ে তিনি যেন কিছু গোল না করেন। লোকসান আমি পুরিয়ে দেব। আর তোকেও বলছি, আমি যে কিছু জানতে পেরেছি এ-কথা যেন তোর ভগ্নীপতি না টের পান।”

“মাপ করো, দিদি, আমাকে মাপ করো” এই ব'লে উর্মি আবার দিদির পায়ের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

শর্মিলা চোখের জল মুছে ক্লান্ত সুরে বললে, “কে কাকে মাপ করবে বোন। সংসারটা বড়ো জটিল। যা মনে করি, তা হয় না, যার জন্যে প্রাণপণ করি তা যায় ফেঁসে।”

দিদিকে ছেড়ে ঊর্মি একমুহূর্ত নড়তে চায় না। ওষুধপত্র দেওয়া, নাওয়ানো খাওয়ানো শোওয়ানো সমস্ত খুঁটিনাটি নিজের হাতে। আবার বই পড়তে আরম্ভ করেছে, সেও দিদির বিছানার পাশে ব'সে। নিজেকেও আর বিশ্বাস করে না, শশাঙ্ককেও না।

ফল হোলো এই যে, শশাঙ্ক বারবার আসে রোগীর ঘরে। পুরুষমানুষের অন্ধতাবশতই বুঝতে পারে না ছটফটানির তাৎপর্য স্ত্রীর কাছে পড়ছে ধরা, লজ্জায় মরছে ঊর্মি। শশাঙ্ক আসে মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচের প্রলোভন নিয়ে, ব্যর্থ হয়। পেনসিলের দাগ দেওয়া খবরের কাগজ মেলে দেখায় বিজ্ঞাপনে চার্লি চ্যাপলিনের নাম। ফল হয় না কিছুই। ঊর্মি যখন দুর্লভ ছিল না তখনও বাধার ভিতর দিয়ে শশাঙ্ক কাজ-কর্ম চালাতে চেষ্টা করত। এখন অসম্ভব হয়ে এল।

হতভাগার এই নিরর্থক নিপীড়নে প্রথম প্রথম শর্মিলা বড়ো দুঃখেও সুখ পেত। কিন্তু ক্রমে দেখলে ওর যন্ত্রণা উঠছে প্রবল হয়ে, মুখ গেছে শুকিয়ে, চোখের নিচে পড়ছে কালি। ঊর্মি খাওয়ার সময় কাছে বসে না, সেজন্য শশাঙ্কর খাওয়ার উৎসাহ এবং পরিমাণ কমে যাচ্ছে তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়।

সম্প্রতি হঠাৎ এ বাড়িতে আনন্দের যে বান ডেকে এসেছিল সেটা গেছে সম্পূর্ণ ভাঁটিয়ে, অথচ পূর্বে ওদের যে-একটা সহজ দিনযাত্রা ছিল সেও রইল না।

একদা শশাঙ্ক নিজের চেহারার চর্চায় উদাসীন ছিল। নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাত প্রায় ন্যাড়া ক'রে। আঁচড়াবার প্রয়োজন ঠেকেছিল সিকির সিকিতে। শর্মিলা তাই নিয়ে অনেকবার প্রবল বাগবিতণ্ডা ক'রে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ইদানীং উর্মির উচ্চহাস্য-সংযুক্ত সংক্ষিপ্ত আপত্তি নিষ্ফল হয়নি। নূতন সংস্করণের কেশোদ্গমের সঙ্গে সুগন্ধি তৈলের সংযোগ-সাধন শশাঙ্কর মাথায় এই প্রথম ঘটল। কিন্তু তার পর আজ-কাল কেশোন্নতিবিধানের অনাদরেই ধরা পড়ছে অন্তর্বেদনা। এতটা বেশি যে, এ নিয়ে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য তীব্র হাসি আর চলে না। শর্মিলার উৎকণ্ঠা তার ক্ষোভকে ছাড়িয়ে গেল। স্বামীর প্রতি করুণায় ও নিজের প্রতি ধিক্কারে তার বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করে উঠছে, রোগের ব্যথাকে দিচ্ছে এগিয়ে।

ময়দানে হবে কেল্লার ফৌজদারের যুদ্ধের খেলা। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে এল, "যাবে উর্মি, দেখতে। ভালো জায়গা ঠিক করে রেখেছি।"

উর্মি কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই শর্মিলা ব'লে উঠল, "যাবে বই কি। নিশ্চয় যাবে। একটু বাইরে ঘুরে আসবার জন্যে ও যে ছটফট করছে।"

প্রশ্রয় পেয়ে দুদিন না যেতেই জিজ্ঞাসা করলে, "সার্কাস ?"

এ প্রস্তাবে উর্মিমালার উৎসাহই দেখা গেল।

তারপরে, "বোটানিকাল গার্ডেন ?"

এইটেতে একটু বাধল। দিদিকে ফেলে বেশিক্ষণ দূরে থাকতে উর্মির মন সায় দিচ্ছে না।

দিদি স্বয়ং পক্ষ নিল শশাঙ্কর। রাজ্যের রাজ-মজুরদের সঙ্গে দিনে দুপুরে ঘুরে ঘুরে খেটে খেটে মানুষটা যে হয়রান হোলো, সারাদিন কেবল কাটছে ধুলোবালির মধ্যে। হাওয়া না খেয়ে এলে শরীর যে পড়বে ভেঙে।

এই একই যুক্তি অনুসারে স্টীমারে ক'রে রাজগঞ্জ পর্যন্ত ঘুরে আসা অসংগত হোলো না।

শর্মিলা মনে মনে বলে, যার জন্যে কাজ খোয়াতে ওর ভাবনা নেই তাকে সুদ্ধ খোয়ানো ওর সইবে না !

শশাঙ্ককে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেনি বটে কিন্তু

চারিদিক থেকেই সে একটা অব্যক্ত সমর্থন পাচ্ছে। শশাঙ্ক একরকম ঠিক করে নিয়েছে, শর্মিলার মনে বিশেষ কোনো ব্যথা নেই, ওদের দু-জনকে একত্র মিলিয়ে খুশি দেখেই সে খুশি। সাধারণ মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হোতে পারত না কিন্তু শর্মিলা যে অসাধারণ। শশাঙ্কর চাকরির আমলে একজন আর্টিস্ট রঙিন পেনসিল দিয়ে শর্মিলার একটা ছবি এঁকেছিল। এতদিন সেটা ছিল পোর্টফোলিয়োর মধ্যে। সেইটেকে বের করে বিলিতি দোকানে খুব দামি ফ্যাশানে বাঁধিয়ে নিয়ে আপিসঘরে যেখানে বসে ঠিক তার সমুখে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে। সামনের ফুলদানিতে রোজ মালী ফুল দিয়ে যায়।

অবশেষে একদিন শশাঙ্ক বাগানে সূর্যমুখী কী রকম ফুটেছে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ ঊর্মির হাত চেপে ধরে বললে, "তুমি নিশ্চয় জানো, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আর তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করিনে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।"

এ-কথা দিদি বারবার ক'রে ঊর্মিকে স্পষ্ট বুঝিয়ে

দিয়েছে যে, তার অবর্তমানে সবচেয়ে যেটা সান্ত্বনার বিষয় সে ঊর্মিকে নিয়েই। এ সংসারে অন্য কোনো মেয়ের আবির্ভাব কল্পনা করতেও দিদিকে বাজত, অথচ শশাঙ্ককে যত্ন করবার জন্যে কোনো মেয়েই থাকবে না এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থাও দিদি মনে মনে সইতে পারত না। ব্যবসার কথাও দিদি ওকে বুঝিয়েছে, বলেছে, যদি ভালোবাসায় বাধা পায় তাহলে সেই ধাক্কায় ওর কাজকর্ম সব যাবে নষ্ট হয়ে। ওর মন যখন তৃপ্ত হবে তখনি আবার কাজকর্মে আপনি আসবে শৃঙ্খলা।

শশাঙ্কের মন উঠেছে মেতে। ও এমন একটা চন্দ্রলোকে আছে যেখানে সংসারের সব দায়িত্ব সুখতন্দ্রায় লীন। আজকাল রবিবার-পালনে বিশুদ্ধ খ্রীস্টানের মতোই ওর অস্খলিত নিষ্ঠা। একদিন শর্মিলাকে গিয়ে বললে, "দেখো, পাটের সাহেবদের কাছে তাদের স্টীমলঞ্চ পাওয়া গেছে,— আজ রবিবার, মনে করছি ভোরে ঊর্মিকে নিয়ে ডায়মণ্ডহার্বারের কাছে যাব, সন্ধ্যার আগেই আসব ফিরে।"

শর্মিলার বুকের শিরাগুলো কে যেন দিলে মুচড়ে, বেদনায় কপালের চামড়া উঠল কুঞ্চিত হয়ে। শশাঙ্কের

চোখেই পড়ল না। শর্মিলা কেবল একবার জিজ্ঞাসা করলে, "খাওয়াদাওয়ার কী হবে।" শশাঙ্ক বললে, "হোটেলের সঙ্গে ঠিক করে রেখেছি।"

একদিন এইসমস্ত ঠিক করবার ভার যখন ছিল শর্মিলার উপর, তখন শশাঙ্ক ছিল উদাসীন। আজ সমস্ত উলটপালট হয়ে গেল।

যেমনি শর্মিলা বললে, "আচ্ছা, তা যেয়ো" অম্‌নি মুহূর্ত অপেক্ষা না করে শশাঙ্ক বেরিয়ে গেল ছুটে। শর্মিলার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বারবার করে বলতে লাগল, "আর কেন আছি বেঁচে।"

কাল রবিবারে ছিল ওদের বিবাহের সাম্বৎসরিক। আজ পর্যন্ত এ অনুষ্ঠানে কোনোদিন ছেদ পড়েনি। এবারেও স্বামীকে না ব'লে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত আয়োজন করছিল। আর কিছুই নয়, বিয়ের দিন শশাঙ্ক যে লাল বেনারসির জোড় পরেছিল সেইটে ওকে পরাবে, নিজে পরবে বিয়ের চেলি, স্বামীর গলায় মালা পরিয়ে ওকে খাওয়াবে সামনে বসিয়ে, জ্বালাবে ধূপ-বাতি, পাশের ঘরে গ্রামোফোনে বাজবে সানাই। অন্যান্য বছর শশাঙ্ক ওকে আগে থাকতে না জানিয়ে

একটা কিছু শখের জিনিস কিনে দিত। শর্মিলা ভেবেছিল এবারেও নিশ্চয় দেবে, কাল পাব জানতে।

আজ ও আর কিছুই সহ্য করতে পারছে না। ঘরে যখন কেউ নেই তখন কেবলি ব'লে ব'লে উঠছে, "মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে, কী হবে এই খেলায়।"

রাত্রে ঘুম হোলো না। ভোরবেলা শুনতে পেলে মোটরগাড়ি দরজার কাছ থেকে চলে গেল। শর্মিলা ফুঁপিয়ে উঠে কেঁদে বললে, "ঠাকুর, তুমি মিথ্যে।"

এখন থেকে রোগ দ্রুত বেড়ে চলল। দুর্লক্ষণ যেদিন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে সেদিন শর্মিলা ডেকে পাঠালে স্বামীকে। সন্ধ্যেবেলা, ক্ষীণ আলো ঘরে, নার্সকে সংকেত করলে, চলে যেতে। স্বামীকে পাশে বসিয়ে হাতে ধরে বললে, "জীবনে আমি যে-বর পেয়েছিলুম ভগবানের কাছে, সে তুমি। তার যোগ্য শক্তি আমাকে দেননি। সাধ্যে যা ছিল করেছি। ত্রুটি অনেক হয়েছে, মাপ করো আমাকে।"

শশাঙ্ক কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললে,—"না, কিছু বোলো না। ঊর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার

হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরো অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাওনি। না, চুপ করো, কিছু বোলো না। মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হোলো তোমাকে সুখী করতে পারলুম।”

নার্স বাইরে থেকে বললে, “ডাক্তারবাবু এসেছেন।”

শর্মিলা বললে, “ডেকে দাও।”

কথাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শর্মিলার মামা যত রকম অশাস্ত্রীয় চিকিৎসার সন্ধানে উৎসাহী। সম্প্রতি এক সন্ন্যাসীর সেবায় তিনি নিযুক্ত। যখন ডাক্তাররা বললে আর কিছু করবার নেই তখন তিনি ধরে পড়লেন, হিমালয়ের ফেরত বাবাজীর ওষুধ পরীক্ষা করতে হবে। কোন্ তিব্বতী শিকড়ের গুঁড়ো, আর প্রচুর পরিমাণে দুধ এই হচ্ছে উপকরণ।

শশাঙ্ক কোনোরকম হাতুড়েদের সহ্য করতে পারত

না। সে আপত্তি করলে। শর্মিলা বললে, "আর কোনো ফল হবে না, অন্তত মামা সান্ত্বনা পাবেন।"

দেখতে দেখতে ফল হোলো। নিশ্বাসের কষ্ট কমেছে, রক্ত ওঠা গেল বন্ধ হয়ে।

সাত দিন যায়, পনেরো দিন যায়, শর্মিলা উঠে বসল। ডাক্তার বললে, মৃত্যুর ধাক্কাতেই অনেক সময় শরীর মরিয়া হয়ে উঠে শেষ-ঠেলায় আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে তোলে।

শর্মিলা বেঁচে উঠল।

তখন সে ভাবতে লাগল, "এ কী আপদ, কী করি। শেষকালে বেঁচে ওঠাই কি মরার বাড়া হয়ে দাঁড়াবে।" ওদিকে উর্মি জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। এখানে তার পালা শেষ হোলো।

দিদি এসে বললে, "তুই যেতে পারবিনে।"

"সে কী কথা।"

"হিন্দুসমাজে বোন-সতিনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনোদিন করেনি।"

"ছিঃ।"

"লোকনিন্দা। বিধির বিধানের চেয়ে বড়ো হবে লোকের মুখের কথা!"

শশাঙ্ককে ডাকিয়ে বললে, “চলো আমরা যাই নেপালে। সেখানে রাজ-দরবারে তোমার কাজ পাবার কথা হয়েছিল— চেষ্টা করলেই পাবে। সে দেশে কোনো কথা উঠবে না।”

শর্মিলা কাউকে দ্বিধা করবার অবকাশ দিল না। যাবার আয়োজন চলছে। ঊর্মি তবু বিমর্ষ হয়ে কোণে কোণে লুকিয়ে বেড়ায়।

শশাঙ্ক তাকে বললে, “আজ যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও তাহলে কী দশা হবে ভেবে দেখো।”

ঊর্মি বললে, “আমি কিছু ভাবতে পারিনে। তোমরা দু-জনে যা ঠিক করবে তাই হবে।”

গুছিয়ে নিতে কিছুদিন লাগল। তারপর সময় যখন কাছে এসেছে, ঊর্মি বললে, “আর দিন সাতেক অপেক্ষা করো, কাকাবাবুর সঙ্গে কাজের কথা শেষ করে আসি গে।”

চলে গেল ঊর্মি।

এই সময়ে মথুর এল শর্মিলার কাছে মুখ ভার ক’রে। বললে, “তোমরা চলে যাচ্ছ ঠিক সময়েই। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হয়ে যাবার পরেই আমি

আপসে শশাঙ্কের জন্যে কাজ বিভাগ করে দিয়েছিলেম। আমার সঙ্গে ওর লাভ-লোকসানের দায় জড়িয়ে রাখিনি। সম্প্রতি কাজ গুটিয়ে নেবার উপলক্ষ্যে শশাঙ্ক কদিন ধরে হিসাব বুঝে নিচ্ছিল। দেখা গেল তোমার টাকা সম্পূর্ণ ডুবেছে। তা ছাপিয়েও যা দেনা জমেছে তাতে বোধ হয় বাড়ি বিক্রি করতে হবে।"

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, "সর্বনাশ এতদূর এগিয়ে চলেছিল। উনি জানতে পারেননি!"

মথুর বললে, "সর্বনাশ জিনিসটা অনেক সময় বাজ-পড়ার মতো, যে মুহূর্তে মারে তার আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ জানান দেয় না। ও বুঝেছিল ওর লোকসান হয়েছে। তখনো অল্পেই সামলে নেওয়া যেত। কিন্তু দুর্বুদ্ধি ঘটল; ব্যবসার গলদ তাড়াতাড়ি শুধরে নেবে মনে ক'রে আমাকে লুকিয়ে পাথুরে কয়লার হাটে তেজিমন্দি খেলা শুরু করলে। চড়ার বাজারে যা কিনেছে সস্তার বাজারে তাই বেচে দিতে হোলো। হঠাৎ আজ দেখলে হাউয়ের মতো ওর সব গেছে উড়ে-পুড়ে, বাকি রইল ছাই। এখন ভগবানের কৃপায় নেপালে কাজ পেলে তোমাদের ভাবতে হবে না।"

শর্মিলা দৈন্যকে ভয় করে না। বরঞ্চ ও জানে অভাবের দিনে স্বামীর সংসারে ওর স্থান আরো বেড়ে যাবে। দারিদ্র্যের কঠোরতাকে যথাসম্ভব মৃদু ক'রে এনে দিন চালাতে পারবে এ বিশ্বাস ওর আছে। বিশেষত গয়না যা হাতে রইল তা নিয়ে এখনো কিছু-কাল বিশেষ দুঃখ পেতে হবে না। এ-কথাটাও সসংকোচে মনে উঁকি মেরেছে যে, উর্মির সঙ্গে বিয়ে হোলে তার সম্পত্তিও তো স্বামীরই হবে। কিন্তু শুধু জীবনযাত্রাই তো যথেষ্ট নয়। এতদিন ধ'রে নিজের শক্তিতে নিজের হাতে স্বামী যে সম্পদ সৃষ্টি করে তুলেছিল, যার খাতিরে আপন হৃদয়ের অনেক প্রবল দাবিকেও শর্মিলা ইচ্ছে ক'রে দিনে দিনে ঠেকিয়ে রেখেছে, সেই ওদের উভয়ের সম্মিলিত জীবনের মূর্তি-মান আশা আজ মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল এরই অগৌরব ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। মনে মনে বলতে লাগল, তখনি যদি মরতুম তাহলে তো এই ধিক্কারটা বাঁচত আমার। আমার ভাগ্যে যা ছিল, তা তো হোলো কিন্তু দৈন্য-অপমানের এই নিদারুণ শূন্যতা একদিন কি পরিতাপ আনবে না ওঁর মনে। যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটতে পারল একদিন

হয়তো তাকে মাপ করতে পারবেন না, তার দেওয়া অন্ন ওঁর মুখে বিষ ঠেকবে। নিজের মাতলামির ফল দেখে লজ্জা পাবেন কিন্তু দোষ দেবেন মদিরাকে। যদি অবশেষে ঊর্মির সম্পত্তির উপর নির্ভর করা অবশ্য হয়ে ওঠে তাহলে সেই আত্মাবমাননার ক্ষোভে ঊর্মিকে মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বালিয়ে মারবেন।

এদিকে মথুরের সঙ্গে সমস্ত হিসেবপত্র শোধ করতে গিয়ে শশাঙ্ক হঠাৎ জানতে পেরেছে যে শর্মিলার সমস্ত টাকা ডুবেছে তার ব্যবসায়ে। এ-কথা শর্মিলা এতদিন তাকে জানায়নি, মিটমাট ক'রে নিয়েছিল মথুরের সঙ্গে।

শশাঙ্কের মনে পড়ল, চাকরির অন্তে সে একদিন শর্মিলার টাকা ধার নিয়েই গড়ে তুলেছিল তার ব্যবসা। আজ নষ্ট ব্যবসার অন্তে সেই শর্মিলারই ঋণ মাথায় ক'রে চলেছে সে চাকরিতে। এ ঋণ তো আর নামাতে পারবে না। চাকরির মাইনে দিয়ে কোনোকালে শোধ হবার রাস্তা কই।

আর দিন দশেক বাকি আছে নেপাল যাত্রার। সমস্ত রাত ঘুমতে পারেনি। ভোরবেলায় শশাঙ্ক ধড়্‌ফড়্‌

ক'রে বিছানা থেকে উঠেই আয়নার টেবিলের উপরে হঠাৎ সবলে মুষ্টিঘাত করে বলে উঠল, "যাব না নেপাল।" দৃঢ় পণ করলে, "আমরা দু-জনে উর্মিকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকব—ভ্রুকুটিকুটিল সমাজের ক্রূর দৃষ্টির সামনেই। আর এইখানেই ভাঙা ব্যবসাকে আর একবার গড়ে তুলব এই কলকাতাতেই ব'সে।"

যে-যে জিনিস সঙ্গে যাবে, যা রেখে যেতে হবে, শর্মিলা বসে বসে তারি ফর্দ করছিল একটা খাতায়। ডাক শুনতে পেলে "শর্মিলা, শর্মিলা।" তাড়াতাড়ি খাতা ফেলে ছুটে গেল স্বামীর ঘরে। অকস্মাৎ অনিষ্টের আশঙ্কা ক'রে কম্পিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে।"

বললে, "যাব না নেপালে। গ্রাহ্য করব না সমাজকে। থাকব এইখানেই।"

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, কী হয়েছে।"

শশাঙ্ক বললে, "কাজ আছে।"

সেই পুরাতন কথা। কাজ আছে। শর্মিলার বুক দুরু দুরু করে উঠল। "শর্মি, ভেবো না আমি কাপুরুষ। দায়িত্ব ফেলে পালাব আমি, এত অধঃপতন কল্পনা করতেও পারো ?"

শর্মিলা কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে বললে, "কী হয়েছে আমাকে বুঝিয়ে বলো।" শশাঙ্ক বললে, "আবার ঋণ করেছি তোমার কাছে, সে-কথা ঢাকা দিয়ো না।"

শর্মিলা বললে, "আচ্ছা বেশ।"

শশাঙ্ক বললে, "সেইদিনকার মতোই আজ থেকে আবার ঋণ শোধ করতে বসলুম। যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই এই রইল কথা, শুনে রাখো। একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।"

শর্মিলা স্বামীর বুকের উপর মাথা রেখে বললে, "তুমিও আমাকে বিশ্বাস কোরো। কাজ বুঝিয়ে দিয়ো আমাকে, তৈরি করে নিয়ো আমাকে, তোমার কাজের যোগ্য যাতে হোতে পারি সেই শিক্ষা আজ থেকে আমাকে দাও।"

বাইরে থেকে আওয়াজ এল "চিঠি"।

উর্মির হাতের অক্ষরে দু-খানা চিঠি। একখানি শশাঙ্কের নামে—

আমি এখন বোম্বাইয়ের রাস্তায়। চলেছি বিলেতে। বাবার আদেশমতো ডাক্তারি শিখে আসব। ছয়-সাত বছর লাগবার কথা। তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে আপনিই তা জোড়া লাগবে। আমার জন্যে ভেবো না, তোমার জন্যই ভাবনা রইল মনে।

শর্মিলার চিঠি—

দিদি, শত সহস্র প্রণাম তোমার পায়ে। অজ্ঞানে অপরাধ করেছি, মাপ করো। যদি সেটা অপরাধ না হয়, তবে তাই জেনেই সুখী হব। তার চেয়ে সুখী হবার আশা রাখব না মনে। কিসে সুখ তাই বা নিশ্চিত কী জানি। আর সুখ যদি না হয় তো নাই হোলো। ভুল করতে ভয় করি।